সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

ইসলাম
ধর্ম : সমাজ : সংস্কৃতি

সংকলন ও সম্পাদনা
সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ হাসানী নদভী

তরজমা
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

জমিয়তে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ একাডেমী
বাংলাদেশ

ইসলাম ঃ ধর্ম : সমাজ : সংস্কৃতি
মূলঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
সংকলন ও সম্পাদনাঃ সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ হাসানী নদভী
তরজমাঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশনা ঃ
জমিয়তে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ একাডেমী
বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল ঃ
মুহাররাম ১৪২০ হি.
বৈশাখ ১৪০৬ বাং
এপ্রিল ১৯৯৯ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আ. বি. আই
৭৭, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ঃ
তাওয়াক্কাল প্রেস
১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ২৪ ৮৪ ২০

বাঁধাই ঃ
আল-আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনা ঃ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হক লাইব্রেরী
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্যঃ ৮৫·০০ টাকা মাত্র

ISLAM ঃ DHARMA ঃ SOMAJ ঃ SANSKRITI : (Islam : Religion : Society : Culture) written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi, compiled and editted by Syed Abdullah Hasani Nadvi, Translated into Bengali by A. S. M. Omar Ali and Published by Jamiat-e-Shah Waliullah Academy, Bangladesh.

$ 4.00

যাঁরা প্রকৃত সত্য জানতে আগ্রহী
সত্য গ্রহণে অগ্রণী ও দ্বিধাহীন
সেইসব ত্যাগী সাহসী নবীনদের হাতে

অনুবাদকের অনূদিত কয়েকটি বই

- ঈমান যখন জাগলো – সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
  সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
- মহানবী (সা)-র প্রতিরক্ষা কৌশল
  জেনারেল আকবর খান
- খালিদ বিন ওয়ালিদ ঐ
- মুহাম্মদ বিন কাসিম ঐ
- নবীয়ে রহমত (সা) – সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
- আমার আম্মা ঐ

পূর্বকথা

ইসলাম স্বয়ং স্রষ্টাপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীন ও জীবন-ব্যবস্থা। যুগে যুগে মহান আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমুস সালামের মাধ্যমে তা বিশ্বব্যাপী অনুশীলিত ও প্রচারিত হয়ে আসলেও শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রচারিত দীন ও জীবন-ব্যবস্থাই প্রধানত ইসলাম বলে পরিচিত। বিগত দেড় হাজার বছরব্যাপী পৃথিবীর প্রায় সকল জনপদেই তা প্রচারিত, অনুশীলিত ও বিশ্লেষিত হয়ে আসছে।

সূর্য যতই দেদীপ্যমান হোক না কেন, আলোগ্রহণক্ষমতা কিন্তু সকলের সমান নয়। ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সরল-সহজ দীন হলেও একে উপলব্ধির ব্যাপারে সকলে সমান পারঙ্গমতা দেখাতে পারেন নি। ইসলামের প্রথম যুগের বাহক আল্লাহ্ রাসূল (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও আম্বিয়ায়ে মুজতাহিদীনের যুগ থেকে দূরত্ব যত বাড়ছে, ইসলামের পতাকাবাহী ও সঠিক ব্যাখ্যাকারী উলামায়ে রাব্বানী ও হক্কানীর সংস্পর্শ থেকে মানুষ যত দূরে সরছে, ইসলামের পরিচিতি ততই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আক্রমণ এবং বিদেশী বিজাতীয়দের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কারণে সৃষ্ট হীনমন্যতাবোধসঞ্জাত সমস্যার দ্বারাও আমাদের সমাজ বেশ বিড়ম্বিত, পীড়িত ও বিভ্রান্ত হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে নানারূপ অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার প্রশ্রয় পেয়েছে। আবার অনেক ব্যাখ্যাকারী ইসলামের ব্যাখ্যাদানকালে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকতে পারেননি। যেমন, কোন দার্শনিক যখন ইসলামের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কলম ধরেন, তাতে দর্শনের প্রভাব ও যুক্তিতর্কের প্রাধান্য আর গোপন থাকে না। একজন সূফীর ব্যাখ্যায় আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব প্রাধান্য পেলেও তাঁর ব্যাখ্যা হয় নেহাৎ অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিকতাকেন্দ্রিক। আর তাতে ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক অনেকাংশেই উপেক্ষিত থাকে তাঁর মনের অজান্তেই। পক্ষান্তরে একজন রাজনীতিবিদ যখন ইসলামের ব্যাখ্যায় কলম ধরেন তখন তাতে ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকসমূহ খুবই গুরুত্ব লাভ করলেও তার আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটি সেখানে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। এমতাবস্থায় ইসলামের সর্বাঙ্গসুন্দর একটি পরিচিতি তুলে ধরা সকলের পক্ষে সহজ নয়।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী মাদ্দা যিল্লাহুল আলী রচিত "ইসলামঃ ধর্ম: সমাজ: সংস্কৃতি" একটি সার্থক ইসলাম- পরিচিতিমূলক পুস্তক। লেখক এমন এক ইল্মী ও মুজাহিদ খান্দানের সদস্য যার শিকড়ে রয়েছেন স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যাতে বুকের তপ্ত রক্ত সিঞ্চন করেছেন বালাকোটের শহীদ আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (র)। লেখক তাঁর খান্দানের বুযুর্গানে-দীন ছাড়াও উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গানের সাহচর্য ও দোয়াপ্রাপ্ত। তাঁর যৌবনের বিরাট অংশ ব্যয়িত হয়েছে এ যুগের মুবাল্লিগে আ'যম মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর সাহচর্যে। আরব ও মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে তিনি তাবলীগী মিশন নিয়ে বহুবার গিয়েছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদেই তিনি দীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন বার বার। তাঁর লিখিত পুস্তকাদি আরব-আজম, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমানভাবে সমাদৃত। তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতিমূলক পুরস্কার "ফয়সল পুরস্কার" লাভ করেছেন অনেক বছর পূর্বেই। গত বছর সংযুক্ত আরব আমীরাত কর্তৃক তিনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব বা Man of the Year হিসাবে ঘোষিত ও পুরস্কৃত হন এবং এ বাবদ প্রাপ্ত ১০ লক্ষ দিরহাম (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় এক কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকার সমান)-এর সবটাই ইসলামী শিক্ষার জন্য বিলিয়ে দেন।

ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের তিনি পিতৃসম মুরব্বী এবং বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এই কয়েক মাস পূর্বেই উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ভারতের শির্কমিশ্রিত সংগীত "বন্দে মাতরম" ও "সরস্বতী বন্দনা" ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করলে তিনি তার প্রতিবাদে মুসলমান শিক্ষার্থীরা সরকারী বিদ্যালয় বর্জন করবে বলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারকে নতি স্বীকার করে সে আদেশ বাতিল করতে হয়।

বক্ষ্যমান পুস্তকটি আসলে লেখকের কোন স্বতন্ত্র পুস্তক নয়- এর অধিকাংশই তাঁর "ভারতীয় মুসলমান", "আরকানে আরবা'আ" প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নেয়া। এ ছাড়া আরো কিছু ইসলাম পরিচিতিমূলক রচনা তাঁর বিভিন্ন পুস্তক থেকে নিয়ে এ সংকলনটি সাজিয়েছেন তাঁরই প্রিয়জন সাইয়েদ আবদুল্লাহ হাসানী নদভী। লেখক এ চয়নকে অনুমোদন করেছেন। এর উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দী সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে প্রশংসা লাভ করেছে।

বন্ধুবর মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সুদীর্ঘকাল ধরে আল্লামা নদভীর পুস্তকাদি অনুবাদ করে বাংলা ভাষীদের নিকট তাঁর শ্রদ্ধেয় শায়খ-এর

ফয়েয পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তিনি আল্লামা নদভীর খিলাফতও লাভ করেছেন। মূল বইটি প্রকাশের পূর্বেই তিনি এর বঙ্গানুবাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। কম্পোজের বিড়ম্বনার জন্য প্রকাশ দেরী হলেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে স্বীকৃতি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লামা নদভীর পুস্তকের অনুবাদে তিনি ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা লেখক, সংকলক ও অনুবাদকের এ খেদমতকে কবুল করুন, এর দ্বারা অনাগত কাল পর্যন্ত অগণিত সত্য- পিপাসু লোকের জন্য ইসলামের দ্বার খুলে দিন। সাথে সাথে আমরা আল্লামার নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

খাকসার

তারিখঃ ০৭-০৬-৯৯ ইং।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
ইমাম, বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদ
ও
সম্পাদক, মহানবী স্মরণিকা, ঢাকা।

•

গুযারিশ

ইসলামের পরিচয় ও পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে বহু লেখকই অনেক বই-পুস্তক লিখেছেন এবং ইসলামকে তার স্বরূপে পেশ করতে সফল ও সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন। এঁরা সকলেই তাঁদের স্ব স্ব শ্রম ও প্রয়াসের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার। কিন্তু ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদঘাটনের জন্য এরপরও এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যেখানে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক, ইতিবাচক ও ভারসাম্যমূলক পন্থায় ইসলামের যথার্থ পরিচিতি ও সত্যিকার প্রতিচ্ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হবে। কেননা স্বয়ং মুসলমানদেরই একটা বিরাট অংশ, বিশেষ করে উপমহাদেশের অধিবাসী বহু মুসলমানই আজ অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বাজে কল্প-কাহিনীর শিকার। আজ তারাই ইসলামের পূর্ণ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। এমন কি এক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ইসলাম গ্রহণের বেলায় অমুসলিমদের সামনে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা এসে হাজির হয়। এসব দূর করে ইসলামের সঠিক ও যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা হৃদয়বান প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যেই দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিটি যুগে ও প্রত্যেক এলাকাতে কমবেশি কোন না কোন আকারে পালিত হয়েছে। বর্তমান পুস্তক সে পথেরই অন্যতম মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত, তিনি যেন একে কবুল করেন এবং হেদায়েতের ওসীলা বানান।

পুস্তকটি সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যে, এ পুস্তকে যাই কিছু গ্রহণ করা হবে তা মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (মাদ্দা জিল্লাহু'ল-আলী) লিখিত বই-পুস্তক থেকেই গ্রহণ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই বান্দাকে যেই মকবুলিয়াত, ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিশ্বময় খ্যাতি, ভারসাম্যমূলক চরিত্র ও সামগ্রিকতা দান করেছেন সমকালীন বিশ্বে তা অন্য কারোর মাঝে পাওয়া যায় না। তদুপরি তাঁর ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরই নয় বরং পরস্পরবিরোধী নানা পথ ও মতের মানুষের যেই আস্থা রয়েছে যা মূলত তাঁর ইখলাস তথা নিষ্ঠা, সংবেদনশীলতা, মানবতার প্রতি অপরিসীম দরদ ও বেদনাবোধেরই পরিণতি, তাও এক্ষেত্রে তাঁকে

স্বতন্ত্র মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে ও অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এজন্য তাঁরই লিখিত গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা (বিশেষ করে 'এক নজরে ভারতীয় মুসলমান', 'ইসলামের জীবন-বিধান', 'আরকানে আরবা'আ' নামক পুস্তকাদি) থেকে বর্তমান পুস্তক সংকলিত হয়েছে।

পরিশেষে আমি আমার সেসব বন্ধুদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যারা বড় যত্নে ও পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থকারের লিখিত বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি কপি করেছেন এবং ফটোকপি করে তা গ্রন্থের আকারে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষ করে বন্ধুবর মওলভী রিসালুদ্দীন নদভীর সহযোগিতা মোটেই ভুলবার নয় যিনি গভীর আগ্রহে ও পরিশ্রমে একাজটি করেছেন। মওলভী ওয়াসী সুলায়মান নদভীও আমার কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার যিনি পূর্বোল্লিখিত বন্ধুবর রিসালুদ্দীন নদভীকে অকৃপণভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বন্ধুবর মওলভী মুহাম্মদ শাহেদ নদভীও কৃতজ্ঞতা পাবার অধিকারী যিনি সযত্নে ও গভীর আগ্রহে গোটা বই-এর প্রুফ দেখে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিনীত মুনাজাত, তিনি যেন একে কবুল করেন এবং ইসলামের পরিচয় লাভের মাধ্যম বানিয়ে মানুষের হেদায়াত লাভের দরজা খুলে দেন। প্রবল পরাক্রমশালী মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ হাসানী নদভী

ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবী তার বিরাট বিস্তৃতি ও বিশাল ব্যাপ্তি সত্ত্বেও একটি ঘর ও একই পরিবারের মতই হয়ে গেছে। এর অধিবাসীরা নানা জাতি-গোত্র শ্রেণী-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও তারা কিন্তু একই ঘর ও একই পরিবারের সদস্যদের ন্যায় বসবাস করছে। আর এজন্য পরস্পরে ভদ্রভাবে বসবাস ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সর্বজনস্বীকৃত নীতির স্বার্থে বিভিন্ন জাতি-গোত্র ও শ্রেণী-সম্প্রদায়ের নানা উপাদানের ভেতর ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সহযোগিতার নিমিত্ত অপরিহার্য হল, এক জাতি অপর জাতিগোষ্ঠীর মন-মেযাজ, স্বাদ ও রুচি, তাদের ধর্মীয় মনন-বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে কেবল ওয়াকিফহালই হবে না বরং সেসবের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধও থাকবে।

কিন্তু নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, একই ঘর ও একই পরিবারের সদস্য, একই এলাকার অধিবাসী, একই বাজারে পাশাপাশি গমনাগমনকারী, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও কোর্ট-কাচারীতে যারা উঠা-বসা করেন, রেলওয়ে, বাস ও বিমানযোগে একই সঙ্গে ভ্রমণকারী, খুব সহজেই যাদের পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ বিদ্যমান অথচ তারা একে অন্যের আকীদা, ধর্ম-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী (উপাসনা-চর্চা), ধর্মীয় শিক্ষামালা ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বলতে গেলে এতটাই অজ্ঞ ও অপরিচিত যেমনটি অতীত যুগে ছিল, যখন দুনিয়ার এক প্রান্তের লোক অপর প্রান্ত সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিল, এক অংশের মানুষ অপর অংশ সম্পর্কে অন্ধকারে থাকত। তখন একে অপরকে জানার ও পরিচয়ের সহজ সুযোগই-বা ছিল কোথায়?

উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান আজ প্রায় হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছে; গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, মহল্লায় ও পল্লী-প্রান্তে তাদের মিশ্রিত বসবাস। হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোর্ট-কাচারী ও অফিস-আদালতে, শত বছরের অধিককাল ধরে রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক সংগঠন, রেলওয়ে স্টেশন, পোষ্ট অফিস, বাস ও লঞ্চ টার্মিনালসহ রেল-বাস ও লঞ্চ-স্টীমারে পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে তাদের জানাজানি ও পরিচয়ের সহজ সুযোগ বিদ্যমান। কিন্ত কি বিস্ময় ও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তারা একে অন্যের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বন্ধে, বলতে কি, এতটাই অজ্ঞ ও অপরিচিত

যেমনটি পুরাকালে অধিকাংশ সময় দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যেত। একে অন্যের সম্পর্কে এদের প্রত্যেকের ধারণা ও জানাশোনা অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত, ভাসাভাসা, বড় জোর শ্রুতি ও কল্পনা-নির্ভর। এক দল আরেক দল সম্পর্কে, এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায় সম্পর্কে মারাত্মক রকমের ভুল বোঝাবুঝির শিকার এবং কোন কোন সময় ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা, বিষাক্ত ও মরিচামিশ্রিত ইতিহাস, পাঠ্য পুস্তক, আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় এমন সব গল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নিজেদের মন-মস্তিষ্কে এসবের একটি ভুল ও অপ্রীতিকর ছবি এঁকে বসে আছে। একদল, যারা পক্ষপাতদুষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়, যারা মহৎ অন্তকরণবিশিষ্ট, সাদা তবিয়তের মানুষ-কে যদি অন্য সম্প্রদায়ের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ ও সামাজিক মৌল নীতিমালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করবে কিংবা এমন সব উত্তর দেবে যা শুনে একজন জানাশোনা মানুষ না হেসে পারবে না। লেখক অধিকাংশ সময় সফরে যেয়ে থাকেন এবং এসব সফরে ট্রেনে ও বাসে সকল শ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। আমার বারবার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আসলে হাসি নয়- কান্নার কথা যে, শত শত বছর ধরে একত্রে পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও আমরা একে অপরের সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ! এর দায়িত্ব এককভাবে কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠীর নয়, বরং সকলের ওপরই বর্তায়। বিশেষভাবে তাদের ওপর বর্তায় যারা সমাজকর্মী, যারা দেশকে ভালবাসেন, যারা মানবতার বন্ধু হিসেবে মানুষকে ভালবাসেন। কেননা তারা একের সঙ্গে অন্যের সঠিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার সযত্ন প্রয়াস চালান নি, আর চালালেও সে প্রয়াস যথেষ্ট ছিল না। সভ্য জগত আজ এই মৌলনীতি মেনে নিয়েছে যে, প্রেম ও ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা, আস্থা, শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে বসবাস করা এবং সৎ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহযোগী ও কর্মসঙ্গী হবার জন্য একে অন্যের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা জরুরী। লোকালয়ের প্রত্যেক সদস্য, সকল সম্প্রদায় ও গোত্রের জানা দরকার অপর সদস্য, অপর সম্প্রদায় ও গোত্র কোন্ মৌলনীতির ওপর বিশ্বাসী, কোন্ ব্যবস্থা ও বিধিমালার অনুগত ও অনুসারী এবং সেসবকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে? তার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিকতার বিশেষ রঙ কি? জীবনের কোন্ মূল্যবোধগুলো তার প্রিয়? তার আত্মিক প্রশান্তি ও আস্থাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য কি বস্তু দরকার? কোন্ সে আকীদা-বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তার প্রাণাধিক ও সন্তান-সন্তুতির চাইতেও প্রিয়? তার সঙ্গে কথা বলতে, তার সঙ্গে হাসি-খুশী ও

খোশআলাপের ভেতর দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতে তার কোন আবেগ-অনুভূতির প্রতি আমাকে খেয়াল রাখতে হবে? পারস্পরিক অস্তিত্বের স্বার্থে যেই ভদ্র, সুশীল ও শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বীকৃত মূলনীতি রয়েছে তার প্রথম শর্তই হল দরকারী সীমা পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করা।

এমতাবস্থায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন দল-মতের মধ্যে বিরাট সব বাঁধার বিন্ধ্যাচল দাঁড়িয়ে রয়েছে, মনের ভেতর রয়েছে তিক্ততা আর মস্তিষ্কের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে পরস্পরের প্রতি পর্বত প্রমাণ সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাস।

প্রেম-প্রীতির সঙ্গে বসবাস, হাস্য-কৌতুক, বাক্যালাপ, জীবনের আনন্দ ভোগ, একে অন্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং একে অপরের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মত-পথের প্রতি সম্মানবোধের ন্যায় সম্পদ থেকে (যা জীবনের রওনক ও সৌন্দর্য এবং আল্লাহ্‌র এক অপরিমেয় নে'মত) আমরা সামগ্রিকভাবেই মাহরূম। আর এরই ফলে কোন কোন সম্প্রদায় (আর একথা বলতে ভয় ও শংকার কোন কারণ নেই যে) বিশেষ করে মুসলমানদের যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য আত্মপক্ষ সমর্থনেই ব্যয়িত হচ্ছে।

মুসলমানদের অতীত ও অতীত ইতিহাসে তারা দেশের উন্নতি ও বিনির্মাণে এবং রাষ্ট্রের সংগঠন ও দৃঢ়তা সাধনে কি ভূমিকা রেখেছে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ও কাব্য-সাহিত্যে ও শিল্পকলায় কি প্রবৃদ্ধি সাধন করেছে এবং কি স্মৃতি রেখে গেছে– সে সম্পর্কে লেখকগণ বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। স্বয়ং এই লেখকের "হিন্দুস্তানী মুসলমান" নামক গ্রন্থটি কয়েক বছর হল আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। স্মর্তব্য যে, এটি একটি ঐতিহাসিক বিষয় এবং অধিকাংশ ছাত্র ও গবেষকদের গবেষণার আওতাধীন।

ঠিক তেমনি এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল যে গ্রন্থে মুসলমানরা যা ও যেমন সেদিকে না তাকিয়ে তাদের যেমনটি হওয়া দরকার, তাদেরকে তাদের আসল রঙ ও রূপে তাদেরই স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় নেবার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই কোনরূপ অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণের। ঠিক তেমনি বর্ণনার ক্ষেত্রে কার্পণ্য প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নেই। এজন্য লেখক "হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নজর মে" নামক স্বতন্ত্র একটি পুস্তক লিখেছেন যা উর্দূ, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় কয়েক বছর হল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এরই সঙ্গে এমন একটি বই-এর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট

ছিল যা হবে লঘু ধরনের। কেননা ভলিউম ও বৃহদাকারের বই-পুস্তক পাঠ করা অনেক মুসলিম-অমুসলিম ভাই-এর জন্যই কঠিন হয়ে পড়ে যে বই-এ ইসলামের যথার্থ চিত্র পেশ করা হয়েছে এবং এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, স্নেহভাজন মওলভী সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ হাসানী নদভী (উস্তাদ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা (যিনি এমন এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পুত্র যাঁর আরবী রচনা এবং দাওয়াতী ও তত্ত্বমূলক নিবন্ধসমূহ পাঠ করে আরব লেখক ও সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত অভিভূত হয়ে যেতেন) এই বরকতময় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা সকল শ্রেণী-সম্প্রদায়, শিক্ষিত ও ন্যায়ানুসারী মানুষদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হবে।

লেখকের "হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নজর মে" নামক প্রকাশিত গ্রন্থে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রশিক্ষণ, এমন কি তাদের জীবন-যিন্দেগীর পুরো চিত্রই পেশ করা হয়েছে। লেখকের অন্যান্য গ্রন্থেও মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ এবং তাদের সমাজ ও সভ্যতার মৌল নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। এসব বই সামনে রেখেই বর্তমান গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে। সংকলক নিজে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মত একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি, তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইসলামিক স্টাডিজসহ কয়েকটি মৌলিক সাবজেক্টের উস্তাদ ও শিক্ষকও বটেন। এ ছাড়া পারিবারিক সূত্রেও তিনি এক বিশাল বিস্তৃত ও আস্থা নির্ভর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারকও।

ফলে যে কোন বিবেচনায় পুস্তকটি উপকারী, গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সূচী

প্রথম অধ্যায়

আকায়েদ

ইসলামের অর্থ, মর্ম ও সীমারেখা

আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সোপর্দ করা ও শর্তহীনভাবে পেশ করার নাম ইসলাম এবং ইসলামে দীনের সীমারেখা সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ এমন এক হাকীকত যা আব্‌দ ও মা'বূদ-এর সম্পর্ক অনুধাবন ব্যতিরেকে উপলব্ধি করা যাবে না। প্রতিটি মুসলমান আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরন্তন, স্থায়ী ও সাধারণ। গভীর যেমন এ সম্পর্ক, তেমনি তা বিস্তৃত; সীমাবদ্ধ যেমন, তেমনি তা ব্যাপকও। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"মু'মিনগণ ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হও। আর তোমরা শয়তানের অনুসরণ করোনা। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" সূরা বাকারা, ২০৮ আয়াত;

এখানে সংরক্ষণ নেই, রিজার্ভেশন নেই যে, এতটা আপনার আর এতখানি আমার, এতটা দেশের আর এতটা সরকারের, এতটা আল্লাহ্‌র আর এতটা বংশ, গোত্র ও খান্দানের, এতটা দীন ও মিল্লাতের আর এতটা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য নিবেদিত। না, এমন নয়; এখানে যা কিছু তার সবটাই আল্লাহ্‌র। এখানে সব কিছুই ইবাদত আর ইবাদত। মুসলমানের গোটা জীবনটাই আল্লাহ্‌র সামনে বিনীত ভৃত্যের ন্যায়। দীনের গণ্ডি ও সীমারেখা গোটা জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এতে কোন প্রকার কাটছাঁট করবার কারুর কোন অধিকার নেই। বড় বড় মুজতাহিদ ও সমকালীন ইমামেরও অনুমতি নেই কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধানের একটি শব্দ, একটি বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের।

আল্লাহ দাবি করেন, ইসলাম দাবি করে যে, ইসলামে তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি এবং পরিষ্কারভাবে বলা আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি যে, আমাদের মুসলমানদের উঠা-বসা, চলাফেরা, পানাহার ও সামাজিক আদান-প্রদান, বিয়ে-শাদীর তরীকা, উত্তরাধিকারের পন্থা-পদ্ধতি, মুসলমানদের লেনদেন শরীয়ত থেকে দূরে, অনেক দূরে। কিছু

—২

লোক তো এমন আছে যারা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দীনের পাবন্দ। আলহামদুলিল্লাহ! তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে তাদের মস্তিষ্ক সাফ-সুতরা। রিসালত ও নবুওত সম্পর্কে, পরকাল সম্পর্কে যেসব 'আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের দিল বড্ড পরিষ্কার। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা বড় কাঁচা। এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে পাকাপোখ্‌ত, কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে ও আখলাক-চরিত্রের ব্যাপারে তাদের কথা না বলাই ভাল। লেনদেন ও আখলাকের ক্ষেত্রে তারা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। লেনদেনের ব্যাপার ঘটলে দেখা যাবে খেয়ানত করে বসেছে। মাপজোখের বেলায় কম দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, কিন্তু ব্যবসা যদি শরীকানা হয়, অংশীদারী কারবার হয় তবে এতে সে বেইনসাফী করবে, শরীকের হক মেরে বসবে। পাড়া-প্রতিবেশী কষ্ট পাবে তার থেকে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"মুসলমান সে-ই যার মুখ ও হাত (-এর কষ্ট) থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

"তোমাদের কেউ মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে।"

মুসলমানের ভেতর এমন একটা শ্রেণী আছে যাদের কথা না বলাই ভাল। তারা লেনদেন ও আখলাক-চরিত্রকে দীন থেকে বহিষ্কৃত করে রেখেছে। একে তারা ধর্ম বহির্ভূত মনে করে। তারা মনে করে যে, ব্যস! 'আকীদা-বিশ্বাস ঠিক থাকলেই হল আর ইবাদত-বন্দেগী (ইবাদত-বন্দেগীকে তারা নামায- রোযা ও হজ্ব পালন পর্যন্ত সীমিত রাখে) করলেই হল। তারা না লেনদেনের ব্যাপারে পরিষ্কার, না ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান। আমানত রক্ষার ব্যাপারে তাদের যেমন মাথা ব্যথা নেই, তেমনি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বণ্টনেরও তাদের বালাই নেই। এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই তাদের কাছে। হুকূকু'ল -ইবাদ তথা মানুষের অধিকার রক্ষা তাদের নিকট কোন গুরুত্ব বহন করে না। আত্মীয়-স্বজন ও হকদারের হক সম্পর্কে তারা বেপরওয়া, একেবারে মুক্ত, স্বাধীন। মানুষের সাথে লেনদেনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন, তেমনি জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রেও নিজেদের মর্জি মাফিক ও খেয়াল-খুশিমত তারা কাজ করে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেসব মুসলমান নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তাঁরা ছিলেন দীনের পূর্ণ অনুসারী ও অনুগত। তাঁদেরকে দীনের ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, তাঁদের ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আখলাক-চরিত্র,

প্রথা-পদ্ধতি, অনুষ্ঠানমালা, তাঁদের বিজয়, হুকুমত ও সাম্রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি সব কিছুই এবং তাদের জীবনের সকল শাখাই শরীয়ত মুতাবিক ছিল।[১]

ইসলামে 'আকীদার গুরুত্ব

'উবূদিয়াত-এর মৌলিক ভিত্তি ঈমান ও 'আকীদা বিশুদ্ধ হবার ওপর নির্ভরশীল। যার ঈমান বিকৃত এবং 'আকীদা ত্রুটিযুক্ত, তার কোন ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার কোন আমল সহীহ-শুদ্ধ মেনে নেওয়া হবে না। যার 'আকীদা দুরস্ত এবং ঈমান সহীহ্-শুদ্ধ, এমন লোকের অল্প আমলও অনেক বেশি বলে বিবেচিত। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের জানা জরুরী, যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা, ঈমান আনা এবং সেই মুতাবিক আমল করা জরুরী, যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ব্যতিরেকে কেউ মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হবার অধিকারী নন। এগুলোই সেসব 'আকীদা-বিশ্বাস যা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের ভেতর সার্বিকভাবে একই রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

মৌলিক ইসলামী 'আকীদাসমূহ

ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) তওহীদ তথা একত্ববাদ ঃ তওহীদী 'আকীদা ইসলামের নির্ভেজাল ও তুলনাহীন এক 'আকীদা-বিশ্বাস' যার আওতায় 'আব্দ ও মা'বূদ তথা বান্দা ও তার উপাস্য প্রভুর ভেতর দু'আ ও ইবাদতের জন্য কোন মধ্যবর্তী সত্তার প্রয়োজন নেই। এই 'আকীদায় বহু সংখ্যক উপাস্য প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র প্রকাশ কিংবা প্রতিবিম্বের ধারণা এবং ইত্তিহাদ ও হুলুল (এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ কোন সৃষ্ট জীবের অস্তিত্বে মিশে যান এবং উভয়ে মিলে একই অস্তিত্ব ধারণ করেন)-এর আকীদার কোনরূপ অবকাশ নেই; বরং তওহীদী আকীদায় এক ও বেনিয়ায আল্লাহ্‌র উলূহিয়াত ও ওয়াহদানিয়াতের পরিচয় ও স্বীকৃতি রয়েছে? যাঁর কোন পিতা নেই, নেই পুত্র; যাঁর খোদায়ীত্বে কোন শরীক নেই। গোটা সৃষ্টি জগতের জন্ম ও সৃষ্টি, দুনিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও শৃংখলা বিধান এবং আসমান ও যমীনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত।

---

১. আল্লাহ্‌র একজন অনুগত বান্দাকে উল্লিখিত সকল বিষয়েই খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সামনে সর্বোত্তম নমুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান গুণাবলী। এরপর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সত্তা যার ক্ষুদ্র একটি ঝলক 'চারিত্রিক সভ্যতা'র বর্ণনায় পাঠক দেখতে পাবেন যদ্দরা উক্ত অধ্যায় শুরু হবে। আল্লাহকে মানেন এমন প্রতিটি লোককে তেমন জীবন যাপনের চেষ্টা করা উচিত।

অর্থাৎ কুদরতী কারখানার একজন বানানেওয়ালা কারিগর আছেন যিনি সব সময় আছেন এবং চিরদিন থাকবেন। তিনি সমস্ত ভাল ও প্রশংসনীয় বিষয় ও কামালিয়াতের অধিকারী এবং সর্বপ্রকার দোষত্রুটি, ক্ষতিকর বিষয় ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সকল অস্তিত্ব ও জ্ঞাত বস্তু তাঁর জ্ঞানের অধীন। সমগ্র বিশ্বজগত তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তিনি জীবিত, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাঁর মত কেউ নেই, কেউ নেই তাঁর প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী, কেউ তাঁর সমকক্ষও নেই। তিনি তুলনারহিত, বেমিছাল তিনি। তিনি কারুর সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় ও এর ব্যবস্থাপনা আনজামে তাঁর কোন সাথী নেই, শরীক নেই, মদদগার নেই। ইবাদত-বন্দেগীর হকদার একমাত্র তিনিই। কেবল তিনিই তো যিনি রোগীকে আরোগ্য দান করেন, সৃষ্টিকুলকে রিযিক দান করেন এবং তাদের সব কষ্ট-তকলীফ তিনিই দূর করেন। আল্লাহ ব্যতিরেকে অপর কাউকে উপাস্য-প্রভু বানানো, তার সামনে পরম বিনয় ও ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রকাশ, তাকে সিজদা বা সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত, তার নিকট দু'আ করা কিংবা এমন কোন বিষয়ে সাহায্য কামনা যা মানব শক্তি বহির্ভূত, যা দেবার শক্তি কেবল আল্লাহই রাখেন (যেমন সন্তান দান, ভাগ্যের ভাল-মন্দের পরিবর্তন, সর্বত্র ও সর্বস্থানে সাহায্যের নিমিত্তে পৌঁছে যাওয়া, যে কোন দূরবর্তী স্থানের আবেদন ও আর্ত চীৎকার শুনতে পারা ও তাতে সাড়া দেওয়া, অন্তরের গুপ্ত কথা ও লুক্কায়িত বিষয় জানতে পারা ইত্যাদি) ইসলামের পরিভাষায় শির্ক বলে। শির্ক সবচে' বড় গোনাহ যা তওবাহ ব্যতিরেকে মাফ হয় না।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"তাঁর শান হল এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি তখন তাকে বলেন 'হও', ফলে সেটা হয়ে যায়।" সূরা ইয়াসীন, ৮২ আয়াত;

আল্লাহ তা'আলা না কোন মানব দেহে অবতরণ করেন কিংবা কোন সত্তায় প্রবিষ্ট হন; না তিনি কারুর রূপ ধারণ করেন। কেউ তাঁর অবতার হয় না। তিনি কোন স্থানে, দিকে কিংবা গণ্ডীতে সীমিত বা আবদ্ধ নন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি ধনী ও বেনিয়ায; তিনি কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ওপর কারুর হুকুম চলে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যায় না যে, তিনি কি করছেন? অর্থাৎ তাঁর কাজ সম্পর্কে তাঁকে জওয়াবদিহি করতে হয় না। হিকমত তথা প্রজ্ঞা তাঁর একটি গুণ। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই হিকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসুলভ এবং ভালর জন্যই হয়েছে। তিনি ভিন্ন কোন (প্রকৃত) নির্দেশদাতা ও যথার্থ হাকিম নেই।

(২) তকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা ঘটবার আগে তিনিই প্রথম জানেন এবং যা ঘটবার ও ঘটাবার তিনিই ঘটান।

(৩) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও নৈকট্যের অধিকারী (মুকার্রাব) বহু ফেরেশতা আছে তাঁর। আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে শয়তানও রয়েছে, য়ারা মানুষের যাবতীয় মন্দ ও অনিষ্টের কারণ হয়। আর জিন্ন জাতিও রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকুলের ভেতর।

(৪) কুরআন পাক আল্লাহ্র কালাম। এর শব্দ ও মর্ম সব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত ও অবতীর্ণ। এটি পরিপূর্ণ একটি কিতাব। সকল প্রকার বিকৃতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন থেকে মুক্ত, পবিত্র ও সংরক্ষিত। যদি কেউ বলে বা বিশ্বাস করে যে, কুরআন পাক বিকৃত হয়েছে কিংবা এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে তবে সে মুসলমান নয়। ইসলামের গণ্ডি থেকে সে খারিজ হয়ে গেছে।

(৫) শারীরিক মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য, পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কারও সত্য, সত্য আখিরাতের হিসাব-নিকাশ; জান্নাত-জাহান্নামও তেমনি সত্য।

(৬) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবীদের দুনিয়ায় আগমন সত্য এবং আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) -এর মৌখিক ও তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার তাঁর বান্দাদের আদেশ-নিষেধ জ্ঞাপন ও শিক্ষাদান সত্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী ও আখেরী রসূল। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। তাঁর দাওয়াত, তাঁর নবুওত ও রিসালত তামাম দুনিয়াবাসীর জন্য। এই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে এবং এতদ্ভিন্ন এ ধরনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্যে তিনি সমস্ত নবীদের মধ্যে আফযল ও উত্তম। তাঁর নবুওত ও রিসালতের ওপর ঈমান আনয়ন ব্যতিরেকে কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় আর কোন দীনও গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামই একমাত্র সত্য দীন। ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোন দীন বা ধর্ম আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আখিরাতের নাজাতও অন্য কোন ধর্মে নেই। শরীয়তের হুকুম-আহকামের পাবন্দী থেকে কেউ মুক্ত নন তা যত বড় আল্লাহওয়ালাই হোক কিংবা ইবাদত-বন্দেগী ও পরহেযগারীর যতবড় চূড়ান্ত দর্জায় কেউ পৌছে যাক।

(৭) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর মুসলমানদের ইমাম ও সত্যনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন। এরপর হযরত ওমর (রা), অতঃপর হযরত উছমান (রা), অতঃপর হযরত 'আলী (রা)। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা ও পথ-প্রদর্শক। তাঁদের সমালোচনা তথা তাঁদের সম্পর্কে মন্দ ও বিরূপ আলোচনা হারাম। তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের জন্য ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

ইসলামের রোকনসমূহ

আকায়েদের পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়[১] যার ওপর ইসলাম বিরাট জোর ও তাকীদ দিয়েছে, তা হল ইবাদত। আর মানব সৃষ্টির পেছনে প্রধানতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও ছিল তাই। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে স্বয়ং ইরশাদ করেন ঃ

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" সূরা যারিয়াত, ৫৬ আয়াত;

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক সজ্ঞান ও সাবালক মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর চারটি জিনিস ফরয আর এজন্যই একে দীনের চার রোকন বা স্তম্ভ চতুষ্টয় বলা হয়। এগুলো হল: (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায); (২) যাকাতের শর্ত পূরণ হলে বছরে একবার মালের যাকাত প্রদান; (৩) মাহে রমযানের সিয়াম (রোযা); (৪) খানায়ে কা'বার হজ্জ (সামর্থ্য থাকার শর্তে) যা জীবনে একবার ফরয।

এগুলো এমন ফরয যা অস্বীকার করলে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যেতে হয় এবং এসব রোকন স্থায়ীভাবে তরককারীও মুসলমানদের জামা'আত থেকে খারিজ হয়ে যায়।

সালাত (নামায) : ইসলামের প্রথম রোকন

ইবাদতের ভেতর প্রধানতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোকন হল সালাত বা নামায। এটি দীনের স্তম্ভ। দীনের প্রতীক চিহ্ন এটি এবং মুসলমানদের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন। এমনকি একে ইসলাম ও গায়র ইসলামের ভেতর পার্থক্যকারী সীমারেখা (Line of demarcation) ও বিশিষ্টতাসূচক হিসাবেও অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমরা সালাত কায়েম করবে আর মুশরিকদের শামিল হবে না।" সূরা আর-রূম, ৩১ আয়াত;

---

১. দস্তুর হায়াত, ও 'হিন্দুস্তানী মুসলমান একনজর মে' নামক গ্রন্থদ্বয় থেকে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত পরিত্যাগ করা।" বুখারী, জাবির (রা) থেকে বর্ণিত।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

"কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত পরিত্যাগ করা।" তিরমিযী; সালাত হল নাজাত ও মুক্তির শর্ত এবং ঈমানের রক্ষাকারী মুহাফিজ। আল্লাহ্ তা'আলা একে হেদায়েত ও তাকওয়া হাসিলের বুনিয়াদী শর্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সালাত প্রতিটি স্বাধীন ও পরাধীন গোলাম, ধনী-গরীব, সুস্থ-অসুস্থ, মুসাফির-মুকীম সকলের ওপর সব সময় ও সর্বাবস্থায় ফরয। বয়ঃপ্রাপ্ত কোন মানুষ কোন অবস্থাতেই এর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে অক্ষম হয় তবে বসে, বসেও অক্ষম হলে শুয়ে আর শুয়েও সক্ষম না হলে ইশারা-ইঙ্গিতে সালাত আদায় করতে পারে, তবুও কোন অবস্থাতেই সালাত আদায় থেকে সে অব্যাহতি পাবে না। এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও (বিশেষ প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে) সালাত আদায়ের হুকুম রয়েছে, যা সালাতু'ল-খওফ নামে পরিচিত। সফরে এতটুকু রে'আয়েত করা হয়েছে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতগুলো (যেমন জোহ্র, আসর ও এশা) দু'রাক'আত আদায় করবে। অবশিষ্ট সুন্নত ও নফলগুলো ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। সুন্নতে মুওয়াক্কাদার তাকীদ সফরে রহিত করা হয়েছে।

সালাত এমন এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ফরয) যা থেকে কোন নবী-রসূলও মুক্ত নন, সেখানে কোন গুণী, সূফী-বুযুর্গ ও মুজাহিদের এথেকে মুক্ত ভাবার তো প্রশ্নই ওঠেনা। সালাত মু'মিনের জন্য এমন যেমন মাছের জন্য পানি। সালাত মু'মিনের জন্য আশ্রয় ও নিরাপত্তাস্থল। যদি সালাত প্রকৃতই সালাত হয় তবে তা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত, গায়রুল্লাহ্র গোলামী বা দাসত্ব, জাহিলী যিন্দেগী ও হীন চরিত্রের সঙ্গে মিলবে না। কেননা এতদুভয়ের ভেতর সুস্পষ্ট বৈপরিত্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ

'সালাত বিরত রাখে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে।" সূরা 'আনকাবূত, ৪৫ আয়াত;

সালাত এক রূহানী খোরাক

যেহেতু মানুষকে এই যমীনের বুকে আল্লাহ্র খলীফা হতে হবে এবং[১] অত্যন্ত নাযুক দায়িত্বে তাকে অধিষ্ঠিত হতে হবে এজন্য তার ভেতর

১. দস্তুরে হায়াত থেকে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত

কামনা-বাসনা রাখা হয়েছে এবং কিছু প্রয়োজনও তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়া হয়েছে। তার ভেতর আবেগ যেমন আছে, তেমনি ভালবাসার জ্বালাও আছে। দুঃখ-কষ্টের ও জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভূতি যেমন আছে, তেমনি আছে আনন্দ-চেতনা ও আনন্দ উপলব্ধিও। গবেষণার আনন্দ-সুখ যেমন আছে, তেমনি আছে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনাও। সে পৃথিবীর বুকে লুক্কায়িত ধন-ভাণ্ডার ও খনিজ সম্পদ থেকে উপকৃত হয় এবং সেগুলোকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনুকূলে ব্যবহার করার পূর্ণ যোগ্যতা ও সামর্থ্যও সে রাখে। এই নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার (দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব পালন এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে মহাশূন্যের বস্তুনিচয়, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদরাজি, জড় ও অজৈব বস্ত্র এবং পশু-পক্ষীর ন্যায় অব্যাহত কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা ও নিরন্তর তসবীহ্-তাহ্‌লীল ও যিক্‌র-আযকারের পাবন্দ বানানো হয়নি বরং এ সমস্তর বাইরে মানুষের জন্য এমন এক ইবাদত পদ্ধতি বা ইবাদত-বন্দেগীর ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল যা তার প্রকৃতি, তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের মর্যাদা, এই সৃষ্টি জগতে তার সম্মান ও মর্যাদা যা তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ–ঐশী খিলাফতরূপে তার কাঁধে চাপানো হয়েছে।

একদিকে ইবাদত-বন্দেগী তার জন্য অপরিহার্যও ছিল এজন্য যে, এ ছিল তার স্বভাব ও প্রকৃতির দাবি ও চাহিদা, তার অস্তিত্বের পেছনে নিহিত অভিপ্রায় বা ইচ্ছা, তার চিত্তের আওয়াজ, তার ভদ্রতা, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ, মানবতার প্রয়োজন এবং দিল ও আত্মার খোরাক। অপর দিকে এও অপরিহার্য ছিল যে, এই ইবাদত-বন্দেগী তার কাঠামো, আকৃতি ব্যক্তিত্ব মাফিক, তার নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগত মর্যাদা এবং এই সৃষ্টিজগতে তার একক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং সেই পোশাকের মত হবে যা হবে তার শরীরের আকার আয়তন মাফিক ও শরীরে মানাবে। তা যেন বেশি আটসাঁট বা চিপা না হয়, আবার বেশি ঢিলা-ঢালাও না হয়। কমও যেন না হয়, আবার বেশিও নয়।

সালাত প্রকৃতপক্ষে এই পোশাক যা ঠিক ঠিক তার শরীরের উপযোগী যার ভেতর কোন প্রকারের কম বেশি চোখে পড়ে না।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ

আমি প্রতিটি বস্তুই পরিমিত সৃষ্টি করেছি (সূরা আল-কামার, ৪৯ আয়াত)।

এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (যা ফরয করা হয়েছে) সেই নির্ধারিত ওয়াক্তগুলোতে আদায় করা দরকার যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদে সেই সব ওয়াক্তের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত

সালাতের জন্য রাক'আতও নির্ধারিত। সালাতের ক্ষেত্রে ওয়াক্তের পাবন্দী করা অর্থাৎ সময়মত সালাত আদায় করা জরুরী।

সালাত কিভাবে আদায় করবেন

আল্লাহ্ তা'আলা সালাত তথা নামাযকে সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা, কান্না ও ভয়-ভক্তি মিশ্রিত বিনয়, ভাবগম্ভীর ও গুরুত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার এমন এক পরিবেশ দান করেছে যার নজীর অপর কোন ধর্মে কিংবা জাতির ইবাদত-বন্দেগীর ভেতর পাওয়া যায় না। এর পরিমাপ আমরা সেই সব প্রজ্ঞাময় হুকুম-আহ্কাম তথা বিধি-বিধান, আইন-কানুন, পথনির্দেশনা ও শিক্ষামালা থেকে করতে পারব যা সামনে পেশ করা হবে।

এখন আসুন আমরা একটু জানতে চেষ্টা করি যে, সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়, এতে কি পড়তে হয়, কিভাবে দাঁড়াতে হয়, কিভাবে ঝুঁকব আর কিভাবেই বা আমরা তা শুরু করব ও পেশ করব।

আযান

সর্বপ্রথম আযানের কথাই ধরুন। আযান প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত বুলন্দ আওয়াজে বলা ও দেওয়া হয় এবং এর উত্থিত ধ্বনি থেকে কোন গ্রাম, শহর কিংবা সম্মিলিত জনবসতিই মুক্ত নয়। প্রথমে আসুন আমরা আযানের শব্দগুলোই শুনি, এরপর এর অর্থ পাঠ করি।

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান	الله اكبر الله اكبر
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান	الله اكبر الله اكبر
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।	اشهد ان لا اله الا الله
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।	اشهد ان لا اله الا الله
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল।	اشهد ان محمدا رسول الله
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল।	اشهد ان محمدا رسول الله
সালাতের জন্য এস, নামাযের জন্য এস।	حى على الصلوة
কল্যাণের জন্য এস, মঙ্গলের জন্য এস।	حى على الصلوة
	حى على الفلاح
	حى على الفلاح
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।	الله اكبر الله اكبر
আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই।	لا اله الا الله

আযান সালাতের ঘোষণা এবং ইসলামের আহ্বান

সালাতের ঘোষণা ও আহ্বানের জন্য যেই ধ্বনি (আযান) আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন এর ভেতর কেবল সালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নামাযের অর্থ ও তাৎপর্যই প্রকাশিত হয়নি বরং এতে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তৌহীদের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন এবং দীনের রূহও পূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে অলংকারিক ভাষায় সংক্ষেপে, সৌন্দর্যমণ্ডিত গীতিধর্মিতা সহকারে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ঘোষণা (যা মুওয়ায্যিন দৈনিক পাঁচ বার মসজিদের সুউচ্চ মীনার থেকে সমুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন) ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও নিবিড় দাওয়াতের আকার ধারণ করেছে। এটাই সেই একক-ধ্বনি যা সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্য থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত এবং এর ভেতর দীনের মূল বিষয় ও সারাংসার এসে গেছে।

আযান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের ঘোষণাও যে, তাঁর পবিত্র সত্তা সকল সত্তা থেকে শ্রেষ্ঠতম সত্তা। অতঃপর এতে দু'টো সাক্ষ্যও বিদ্যমানঃ আল্লাহ্র একত্বের তথা তৌহীদের সাক্ষ্য এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালতের সাক্ষ্য।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এতে সালাতে হাজির হবার আহবান জানানো হয়েছে এবং এও প্রকাশ করা হয়েছে যে, সালাত বা নামায দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় জাহানেই মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের পথ এবং এ ছাড়া মঙ্গল ও কল্যাণ কোথাও লাভ করা যাবে না। এ সবের কারণে আযান এমন এক সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত ও অলংকারপূর্ণ ঘোষণায় পরিণত হয়েছে যা হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়কে একই সময় সম্বোধন করে, মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কেই আকৃষ্ট করে, অলস লোকের ভেতর কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করে এবং গাফিলকে সজাগ ও জাগ্রত করে।

পাক-পবিত্রতা অর্জন

সালাতের জন্য পাক-পবিত্রতা অর্জন ও ওযূর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

"মু'মিনগণ! তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে (মাস্‌হ করবে) এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধোবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও আর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে; আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" সূরা মায়িদাঃ ৬ আয়াত;

পবিত্রতার এই ইহতিমাম ও ওযূ যদি ঈমান ও ইহতিসাব-এর সাথে সম্পন্ন হয় তাহলে তা মানুষের ভেতর এক ধরনের সজাগ-সচেতনতা ও কর্মক্ষমতা, ধারণা ও মনোযোগের কায়ফিয়াত এবং সালাতের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও এর নূর ও সকীনা (এক প্রকার তৃপ্তি ও প্রশান্তি) গ্রহণ করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে।[১] রসূলুল্লাহ (সা) ওযূ ও পবিত্রতা হাসিলের উপকারিতার পূর্ণতা এবং সালাতের প্রস্তুতির নিমিত্ত (বস্তুত যা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মু'মিনের গোপন কানাকানি ও একান্ত আলাপ, দু'আ ও মুনাজাত) মেসওয়াক (দাঁতন) করারও শিক্ষা দান করেছেন এবং খুবই তাকীদের সঙ্গে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এমন কি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, "যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর হবার ভয় না থাকত তবে প্রতিটি সালাতের ওয়াক্তে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম" (বুখারী ও মুসলিম)।

---

১. ঈমান ও ইহতিসাবের অর্থ এই যে, তার আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং তদীয় রসূলের কথিত ছওয়াব ও পুরস্কারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে এবং সে এই সব আমলকে আগ্রহ ও আজমতের সঙ্গে আঞ্জাম দেবে। আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত ও ওজনে ভারী হবার ব্যাপারে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, যখন কোন মু'মিন বা মুসলমান বান্দা ওযূ করে, আপন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন এর দ্বারা তার মুখমণ্ডল থেকে সেই সব গোনাহ যা সে তার চোখ দিয়ে করেছে, পানির সঙ্গে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে ধুয়ে মুছে যায়। যখন সে হাত ধোয় তখন হাত ধোয়া পানি কিংবা পানির শেষ ফোটাটির সঙ্গে তার হাতের দ্বারা কৃত যাবতীয় গোনাহ বেরিয়ে যায়। এমন কি সে গোনাহ থেকে একেবারে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। সহীহ্ মুসলিম ও মুওয়াত্তা গ্রন্থে এতটুকু বেশি আছে যে, "যখন সে তার পা ধোয় তখন সে তার পায়ে হেটে যত গোনাহ করেছে তা সবই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়" (তিরমিযী)।

সালাতের পূর্বে ওযূ

সালাতের আগে মুসলমানকে ওযূ করতে হয়। ওযূ পাক-পবিত্রতা হাসিলের সেই বিশেষ পন্থা বা প্রক্রিয়ার নাম যা ছাড়া সালাত হয় না। ওযূর ভেতর সর্বপ্রথম দুই হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধুতে হয়। এরপর তিনবার কুলি করা হয়। এরপর তিনবার পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করতে হয়। এরপর সমগ্র মুখমণ্ডল অর্থাৎ কপালের উপরিভাগে চুল উঠবার স্থান থেকে নিচে থুতির নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত ধূতে হয়। এরপর প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই সমেত তিনবার[১] ধুতে হয়। এরপর একবার ভেজা হাত দিয়ে সমস্ত মাথা মাস্‌হ্ করতে হয় অর্থাৎ ভেজা হাত মাথার চুলের ওপর দিয়ে একবার বুলিয়ে নিতে হয়। অতঃপর ডান পা ও পরে বাম পা টাখনু অবধি তিনবার ধুতে হয়। পেশাব-পায়খানা ও বায়ু নির্গত হলে ওযূ ভেঙে যায় এবং পুনরায় ওযূ করার দরকার পড়ে। এ ছাড়া সালাত বা নামায দুরস্ত হয় না। ঘুমালেও ওযূর আবশ্যকতা দেখা দেয়। এক ওযূ দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের সালাত আদায় করা যায় যদি কোন কারণে তা না ভাঙে।

মসজিদে মুসলমানদের নিয়মিত আমলসমূহ

মসজিদে গিয়ে ওযূ থাকলে তখনই আর ওযূ না থাকলে ওযূ করে সুন্নত কিংবা নফল পড়তে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে চুপচাপ সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে কিংবা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে অথবা কোন ব্যক্তিগত আমল বা ওজীফা পাঠে মশগুল হবে। জামা'আতের সময় হলে একামত বলতে হয় যা সালাত শুরু হবার পূর্ব ঘোষণা বিশেষ। এতেও সে সব শব্দ ও বাক্যই বলতে হয় যা আযানে বলা হয়। কেবল দু'টো বাক্য বেশি বলতে হয়: قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

সালাত দাঁড়িয়ে গেছে, সালাত দাড়য়ে গেছে;

কাতারবন্দী ও জামা'আত

যে সব লোক মসজিদে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিংবা কোন আমলে মশগুল থাকে তারা সবাই কাতারে এসে দাঁড়িয়ে যায়। একামত শেষ হতেই ইমাম,[২] যিনি

---

১. তিনবার ধোয়া সুন্নত। দু'বার কিংবা একবার ধুলেও ওযূ হয়।

২. ইসলামে ইমাম ও আলিমদের কোন বিশেষ শ্রেণী নেই যাদের ছাড়া মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করা যাবে না। যে কোন মুসলমান এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু এখন ব্যবস্থাপনাগত সুবিধা ও স্বার্থে অধিকাংশ মসজিদে ইমাম ও মুওয়াযযিন নির্ধারিত আছেন। যেহেতু তাঁরা এই কাজের জন্য নিজেদেরকে পেশ করে থাকেন সেজন্যমহল্লাবাসী কিংবা ওয়াক্‌ফ বিভাগ থেকে তাঁদের বেতন দেওয়া হয়।

মহল্লার কোন আলিম-ই দীন কিংবা হাফিজ-এ কুরআন অথবা লেখাপড়া জানা কোন মুসলমান, তকবীর বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠিয়ে অতঃপর নাভির ওপর হাত বাঁধেন এবং নামায শুরু করেন। আর এভাবেই তিনি ও তাঁর সাথী মুকতাদীবৃন্দ গোলামের ন্যায় হাত বেঁধে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ইমাম মুসল্লীদের থেকে সামনে মধ্যখানে দাঁড়ান। কিছুটা দেরী করে ইমাম ও মুকতাদী সকলেই চুপ চাপ থেকে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে থাকেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ -

" হে আল্লাহ! পবিত্রময় তোমার সত্তা আর তোমারই প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময় আর তোমার শান সমুন্নত এবং তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।"

এরপর সালাত যদি জেহরী[১] হয় তবে ইমাম সাহেব সজোরে কিরা'আত শুরু করে দেন এবং উল্লিখিত দু'আ পাঠের পর তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এটা এমন একটি সূরা যা প্রতিটি সালাতে প্রত্যেক রাক'আতেই পাঠ করা হয়। এটি কুরআন মজীদের মুখবন্ধ এবং ইসলামের সংক্ষিপ্ত-সার। এটি কুরআন মজীদের সর্বাধিক পঠিত সূরা এবং ইসলামে এই সূরাটির বিরাট ফযীলত রয়েছে। এজন্য নিম্নে তরজমাসহ সূরাটি উদ্ধৃত করা হল।

بسم الله الرحمن الرحيم - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّاۤلِّيْنَ- اٰمين -

"সর্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মেহেরবান, দয়ালু। প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই নিকট কেবল সাহায্য চাই। আমাদের পরিচালিত কর সোজা সরল পথে। সে পথে যে পথের ওপর তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ; তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত আর যারা পথভ্রষ্ট।" সূরা ফাতিহা, ১-৭ আয়াত।

এই সূরা পাঠ শেষ হলে ইমাম ও মুকতাদী 'আমীন' বলেন যার অর্থ, "হে আল্লাহ! আমাদের দু'আ কবুল কর।"

---

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ভেতর তিন ওয়াক্ত যথাক্রমে ফজর, মাগরিব ও এশা জেহরী এবং বাকী দুই ওয়াক্ত জোহর ও আসর সিরবী। সিররী সালাতের কেরাত জোরে পাঠ করা হয় না।

সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআন মজীদের এমন কোন অংশ তেলাওয়াতের হুকুম রয়েছে যা মুখস্থ এবং সহজেই মনে আসে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

"কাজেই কুরআনের যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তেলাওয়াত কর।" এর উদ্দেশ্য এই যে, এর অর্থ ও কায়ফিয়াত যেন ভালভাবে অন্তরে গেঁথে যায়, হৃদয় মন যেন এর দ্বারা অধিকতর শক্তি ও খাদ্য লাভ করে, আয়াতগুলোর যেন ভালভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে এবং এর জড়-মূল গভীর ও দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এজন্য সালাত তথা নামায একই সঙ্গে ইবাদত এবং তা'লীমও বটে।

এরপর ইমাম সাহেব কুরআন শরীফের কোন সূরা কিংবা কুরআন পাকের কিছু আয়াত পাঠ করেন। এখানে দু'টি সংক্ষিপ্ততম সূরা তরজমাসহ পেশ করা হচ্ছে ঃ

بسم الله الر حمن الرحيم - وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থ ঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ওরা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা 'আসর)

بسم الله الرحمن الرحيم - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থ ঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। "বল, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); তিনি কাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস)

এরপর ইমাম তকবীর বলেন এবং তকবীর বলার সঙ্গে সবাই সামনে মাথা নুইয়ে দেন ও ঝুঁকে পড়েন। একে রুকূ বলা হয়। রুকূতে গিয়ে তিনবার কিংবা এর বেশি سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

(পাক পবিত্র আমার মহিমান্বিত প্রভু) বলা হয়। অতঃপর ইমাম বলেন:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

(আল্লাহ শোনেন যে তাঁর হাম্‌দ বর্ণনা করেছে) এবং সকলেই কিছুক্ষণের

জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যায় আর মুকতাদী

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা) বলেন। এরপর ইমাম আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় চলে যান এবং মুকতাদীরাও ইমামকে অনুসরণ-পূর্বক সিজদায় যায়। জিসদার সময় নাক ও কপাল মাটির ওপর থাকে। দুই হাতের তালু খোলা অবস্থায় যমীনের ওপর রাখা থাকে, কনুই থাকে মাটি থেকে ওপরে এবং বগল থেকে আলাদা। হাঁটু থাকে যমীনের ওপর। সিজদায় তিনবার কিংবা এর বেশি

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

(পাক-পবিত্র আমার সমুন্নত প্রভু-প্রতিপালক) বলা হয়। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে বিশেষ এক ভঙ্গিতে সোজা বসে যাওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে পুর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করা হয়।

গোটা নামাযে সিজদা হল আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের সর্বশেষ সূরত এবং আল্লাহ্র সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রিয় আমল হল এই সিজদা। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهٖ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

অর্থাৎ "সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রভু প্রতিপালকের সর্বাধিক নৈকট্য পোঁছে যায়। অতএব তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় বেশি করে তাঁর নিকট দু'আ চাও। আবূ দাউদ-নাসাঈ। মূল্যবান সুযোগকে দুলর্ভ জ্ঞান করে এবং স্বীয় কলিজাটাকে টেনে বের করে এনে আল্লাহ্র সামনে রেখে দেয়। এরপর সে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। অতএব সে তাই করে যা সে প্রথম রাক'আতের পর করেছিল। এভাবেই প্রতিটি রাক'আতকে ধরে নিতে হবে। প্রতি দুই রাক'আতের পর বসা জরুরী। একে বৈঠক বলে। যে বৈঠকের পর দাঁড়াতে হবে সেই বৈঠকে কেবল নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে হয়;

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ -

অর্থ ঃ "মহিমা ও সম্মান-শ্রদ্ধা রহমত ও পবিত্র বস্তুসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত-হে নবী! তোমার ওপর (বর্ষিত) হোক। আমারেদ ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরও (বর্ষিত) হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর (আল্লাহর) বান্দা ও রসূল।"

যেই বৈঠকের পর সালাম ফেরাতে হয় সেখানে নিম্নোক্ত দু'আটি অতিরিক্ত পাঠ করতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত নাযিল কর যেমন তুমি হযরত হবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত নাযিল করেছিলে। নিশ্চিতই তুমি সকল প্রশংসার মালিক, মহা মর্যাদাশালী। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর তুমি বরকত নাযিল কর যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। নিশ্চিতই তুমি প্রশংসনীয় ও সকল প্রশংসার মালিক, মহা মর্যাদাশালী।"

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে দাও দুনিয়াতে কল্যাণ আর দাও আখেরাতে কল্যাণ এবং আমাদেরকে রক্ষা কর জাহান্নামের শাস্তি থেকে।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে, পানাহ চাই আমি তোমার কাছে কবরের শাস্তি থেকে, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে আর আশ্রয় চাই আমি তোমার কাছে মসীহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে।"[১]

মু'মিনের আত্মবিশ্বাস এবং তার দল ও সম্প্রদায় নির্ধারণ

আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার হক আদায় করা এবং তাঁর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ ও সালাম

---

১. হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন তোমাদের ভেতর কেউ তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হয় তখন তোমরা চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় ভিক্ষা করবে ঃ (১) জাহান্নামের শাস্তি থেকে, (২) কবরের আযাব থেকে (৩) জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং (৪) মসীহ দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে।"

পেশের পর মুসল্লীও এই সালাম ও রহমতের ভেতর থেকে কিছু অংশ অবশ্যই পায়, যার সে মুখাপেক্ষী ও আকাংক্ষী যা ইসলামের প্রতীক চিহ্ন এবং মুসলমানদের সালাম। সে বলে

السلام علينا و على عباد الله الصالحين

"সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের ওপর।" আর এভাবেই তার মাকাম (অবস্থানগত সম্মান) ও মর্যাদা নির্ণীত হয়, এর প্রকাশ ঘটে এবং এটা জানা যায় যে, সে সর্বত্র সব জায়গায় সর্বযুগেই নেককার লোকদের সাথী এবং শান্তি ও নিরাপত্তায়, ভ্রাতৃত্ব ও করুণায় তাদের সঙ্গে শরীক ও সমান অংশীদার। একথা তার ভেতর আশা-ভরসা ও আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়, হতাশা, বিষন্নতা ও (মনস্তত্ত্ববিদগণের আধুনিক পরিভাষায়) হীনমন্যতাবাধ দূর করে দেয়। তা তাকে এই উম্মতের অপরাপর মুসল্লীর (যাদের ভেতর বড় বড় উলামা',ফুযালা, নেককার ও আল্লাহওয়ালা শামিল আছেন) সাথে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং সবাইকে একই মর্তবা দেয়।

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

"ওরাই হল আল্লাহ্‌র দল আর মনে রেখে, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।"

সূরা মুজাদালা ঃ ২২ আয়াত;

অতঃপর মুসল্লী নিজের জন্য দু'আ করে এবং জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব, জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা ও পদস্খলন এবং মসীহ্ দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

এজন্য যে, এগুলো এমনই বস্তু যার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করা যেতে পারে এবং সে সবের অনিষ্ট ও ফেতনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য দু'আ করা যেতে পারে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ নূহ 'আলায়হি'স-সালামের পর এমন কোন নবী অতিক্রান্ত হননি যিনি তাঁর জাতিগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন করেন নি। আর আমিও তোমাদেরকে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি এবং সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

সালাতের উত্তম সমাপ্তি

সালাতের সমাপ্তিতে সর্বপ্রকার আদব ও শর্ত খুব ভালভাবে উত্তম উপায়ে আদায় করার পর এবং এর সব রকমের হকের পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও মুসল্লী আপন ত্রুটি-বিচ্যুতির

স্বীকৃতি দেয়। যেন সে বলতে চায় مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

"আমরা সেভাবে তোমার ইবাদত করতে পারিনি যেভাবে তোমার ইবাদত করা হক ছিল।" অতঃপর সে নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে সালাত আদায় সমাপ্ত করে যে দু'আ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে, যিনি নবী করীম (স)-এর উম্মাহর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, শিখিয়েছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

" হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের ওপর আনেক জুলুম করেছি। আর তুমি ছাড়া তো আর কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না। অতএব তুমি তোমার তরফ থেকে মাগফিরাত দিয়ে আমার গুনাহ্গুলো মাফ করে দাও। আর আমার ওপর দয়া কর, রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি পরম ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আর এভাবেই এই সর্বোত্তম ইবাদতের সমাপ্তি ঘটে ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার ও লজ্জানুভূতির ভেতর দিয়ে। কোন আমলের সমাপ্তির জন্য এর থেকে অধিকতর উপযোগী ও সমীচীন আর কিছু হতে পারে না।

সে সালাত তথা নামাযকে এভাবে শেষ করে না যেন সে কোন কয়েদখানায় বন্দী ছিল, এখন তার মুক্তি মিলেছে অথবা কেউ তাকে বেঁধে রেখেছিল-এখন সে সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, বরং সে অত্যন্ত তৃপ্তি ও ভাবগম্ভীরভাবে, অত্যন্ত মিষ্টি ও সুন্দর পন্থায় নামায শেষ করে। সে ডানে ও বামে তার মুখ ফেরায়, সাথী মুসল্লীদেরকে, সকল মুসলমান এবং সাক্ষী হিসেবে সেই সময় উপস্থিত ফেরেশতাদেরকে সালাম জানায় ও বলে - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

তার সালাম দেওয়া থেকে মনে হয় যে, সে যেন এ জগতে ছিল না, অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিল। উপস্থিত ও বর্তমান লোকদের সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্কই আর অবশিষ্ট ছিল না। এক্ষণে সে তার সাবেক জায়গায় ফিরে এসেছে, জীবনের প্রথম কেন্দ্রে সে ফিরে এসেছে এবং তার আশেপাশে যারা রয়েছে, দীর্ঘ সফর কিংবা অনুপস্থিতির পর তাদের মাঝে ফিরে এসে চিরাচরিত নিয়ম মাফিক দেখা হতেই সালাম জানাচ্ছে।

মসজিদ এবং মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব

এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে এমন সব মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যা তার সহজ সারল্য, আড়ম্বরহীনতা, ভাবগম্ভীরতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা, আধ্যাত্মিক ভাবগম্ভীর পরিবেশ,

শান্তিপূর্ণ ও নিরুত্তাপ প্রতিবেশ এবং তওহীদের উন্মুক্ত ও দেদীপ্যমান প্রতীক, পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর উপাসনালয় থেকে একেবারেই ভিন্ন।

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ –

" সেই সকল ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা নূর ঃ ৩৬-৩৭)

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"আর মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিন্ন ঃ ১৮)

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ –

অর্থাৎ " হে বনী আদম! প্রত্যেক সিজদাস্থলে (সালাতে) তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে।"

(সূরা আ'রাফ ঃ ২৯)

মসজিদ স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের দীনী মারাকায তথা ধর্মীয় কেন্দ্র এবং তাদের তা'লীম-তরবিয়ত ও সংস্কার-সংশোধন এবং হেদায়েত তথা দিক-নির্দেশনার উৎসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর সমাধান করা হত, জীবনের বিভিন্ন শাখায় ও বিভিন্ন অভিযানে তাদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দেওয়া হত। যখন কোন বিরাট বড় ঘটনা দেখা দিত কিংবা বড় কোন অভিযান সামনে এসে হাজির হত এবং মুসলমানদের নতুন হেদায়েত ও নতুন পথ-নির্দেশনার দরকার পড়ত তখন রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের মধ্যে (অর্থাৎ অন্যান্য মহল্লার ও দূর-দরাজ এলাকার মুসলমানরাও আজ সালাত মসজিদে নববীতে আদায় করবে; সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হবে) এই ঘোষণা দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন।

اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ

মসজিদের এই কেন্দ্রনীয় ভূমিকা ও সামগ্রিকতা বরাবর বজায় ছিল। মুসলমানদের গোটা জীবন-যিন্দেগী একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। ইল্‌ম ও হেদায়েতের উৎস, সংস্কার-সংশোধন ও ধর্মীয় আন্দোলন সব কিছুই এই কেন্দ্র থেকেই সৃষ্টি হত এবং চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করত।

জুমু'আ সপ্তাহের ঈদ

জুমু'আর দিন জোহর নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর নির্দিষ্ট সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য সেই একই সময় নির্ধারিত যে সময় জোহর নামাযের জন্য নির্ধারিত। এতে জোহরের চার রাকআতের থেকে দুই রাকআত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে জুমু'আর সালাত দুই রাক'আত আদায় করা হয়। অপরদিকে সালাতের পূর্বে এতে খুতবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সালাতে কেরাত জোরে ও সশব্দে পাঠ করা হয়।

জুমু'আ ঃ মর্তবা ও বৈশিষ্ট্য

জুমু'আর সালাত এমন অনেক আদব, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক এমন কতিপয় বাড়তি বৈশিষ্ট্যসম্বলিত যার কারণে এর ভাব-গাম্ভীর্য ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, মুসলমানদের একাত্মতা, নেক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নবতর প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

" হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্‌বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর" । সূরা জুমু'আ ঃ ৯ আয়াত

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ -

"যে ব্যক্তি পর-পর তিন জুমু'আ আলস্যভরে ও অবহেলে পরিত্যাগ করল আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।" (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لينتهن اقوام عن ودعهم الجمعات او لينتهن الله على قلوبهم
ثم ليكونن من الغافلين -

মানুষেরা যেন জুমু'আ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত হয়, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দেবেন, এরপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।' (সুনান চতুষ্টয়)

আল্লাহ্‌র রসূল (স) একবার বলেছিলেন ঃ

لقد هممت ان امر رجلا ليصلى بالناس ثم احرف على رجال يتخلوفون عن الجمعة بيوتهم -

আমার মন চায় যে, আমি কাউকে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিই, এরপর আমি গিয়ে সেই সব লোকের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুমু'আ ছেড়ে দিয়ে আপন ঘরে বসে থাকে।" (মুসলিম ও নাসাঈ)

জুমু'আর সালাতের জন্য গোসল করা, মেসওয়াক করা, খোশবু লাগানো এবং অধিক থেকে অধিকতর পাক-সাফের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিন সালাতের পূর্বে খুতবা প্রদান করা হয়। রসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর দিন যেই খুতবা প্রদান করতেন তা এমন কোন গতানুগতিক প্রথাগত ও অনুকরণসর্বস্ব খুতবা হত না যার ভেতর জীবনের সাড়া মেলে না, স্পন্দন অনুভূত হয় না, মেলে না কোন পয়গাম ও পথ-নির্দেশনা; বরং তা হত জীবন-যিন্দেগী ও ঘটনার সমারোহে ভরপুর, আবার সাথে সাথে তা জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও বটে।

জাবির (রা) বলেন ঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم

"নবী করীম (সা) যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠত এবং তাঁর আওয়াজ বুলন্দ থেকে বুলন্দতর হতে থাকত, মনে হত তিনি যেন কোন সেনাদলকে সকাল-সন্ধ্যার আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করছেন।"

(মুসলিম ও নাসাঈ)

আল্লামা ইবন কায়্যিম তদীয় "যাদু'ল-মা'আদ "গ্রন্থে বলেন ঃ "তিনি খুতবায় তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে ইসলামের নীতিমালা, কায়দা-কানুন ও শরীয়তের তা'লীম প্রদান করতেন এবং আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত বিষয় হলে আদেশ কিংবা নিষেধ করতেন।" (১ম খণ্ড, ১১৫ পৃ)।

খুতবা পরিপূর্ণ নিবিষ্টচিত্তে ও চুপচাপ শুনতে হয় যাতে শ্রোতা এরূপ শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে এর থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা এটি একটি ইবাদতের স্থান, বাগ্মিতা-প্রদর্শনের জায়গা নয়। খুতবাকালীন কথাবার্তা বলা থেকে শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী লোকদের কথাবার্তা থেকে নিষেধ করতেও মানা করা হয়েছে। কেননা এতে করেও খুতবায় শান্ত পরিবেশ ও ভাব-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন ও বিঘ্নিত হবার আশংকা থাকে যা খুতবায় প্রার্থীত ও কাম্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, জুমু'আর দিন (খুতবা প্রদানকালীন) যে তার সাথীকে চুপ করতে বলল সেও বাড়াবাড়ি করল ও বাহুল্য কথা বলল।

একটি আরবী খুতবার তরজমা

এখানে নমুনা হিসেবে একটি আরবী খুতবার তরজমা পেশ করা হচ্ছে, যা উপমহাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত এবং অধিকাংশ বড় বড় আলিম-উলামা এটাই (দেখে অথবা মুখস্থ) পাঠ করে থাকেন।

"হাম্‌দ ও সালাত বাদ–

"লোক সকল! তওহীদকে আঁকড়ে ধর (আল্লাহকে তাঁর যাত ও সিফাতে এক মনে কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না) এজন্য যে, তওহীদই হল আল্লাহ্‌র সবচে' বড় ফরমাঁবরদারী ও সর্বাধিক পসন্দনীয় আমল। প্রতাটি কর্মে আল্লাহ্‌র লজ্জা-শরম ও তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখো। কেননা লজ্জা-শরম ও তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার অভ্যাস সমস্ত নেক কাজের বুনিয়াদ। রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর; কেননা সুন্নাহ আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীর দিকে পথ-প্রদর্শন করে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে সে সিরাতে মুস্তাকীমের পথিক হবে এবং মনযিলে মকসূদে পৌঁছুবে। বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এর পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানী ও গোমরাহী। নিজের গোটা জীবন ও যিন্দেগীতে সত্যের অনুসরণ করবে। কেননা সত্যের ভেতরই নাজাত তথা মুক্তি নিহিত রয়েছে আর মিথ্যাতে রয়েছে ধ্বংস। পরোপকার ও সদয় আচরণকে জীবনের সংবিধানে পরিণত কর। কেননা আল্লাহ পরোপকারী ও সদয় আচরণকারীকে ভালবাসেন। আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কে কখনো নিরাশ হবে না। কেননা তিনি রহমকারীদের মধ্যে সর্বাধিক রহমকারী। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইও না যাতে তুমি সব কিছু খুইয়ে বস। মনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত তকদীরে বরাদ্দকৃত রিযিক কেউ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারুর মৃত্যু আসতে পারে না। এজন্য আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে ও হালাল-হারামের বাদ-বিচার না করে জায়েয ও নাজায়েয পন্থায় রুযী উপার্জনের চেষ্টা করা অর্থহীন। আপন লক্ষ্য হাসিলের জন্য উপায়-উপকরণও উত্তম ও সৎ হওয়া দরকার। সকল কাজে-কর্মে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর, কেননা তাঁর ওপর নির্ভরকারীকে তিনি ভালবাসেন। দু'আর বেলায় ত্রুটি করবে না। কেননা আল্লাহ্ সব প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শোনেন ও তা পূরণ করে থাকেন। তাঁর নিকট নিজের কৃত গোনাহরাজির জন্য ক্ষমা চাইতে থাক ও ইস্তিগফার করতে থাক। এর দ্বারা তোমার বিত্ত-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দেখা দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন ঃ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, ওরা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" সূরা মু'মিন ঃ ৬০ আয়াত

"আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদেরকে কুরআনের সম্পদ থেকে বেশি থেকে বেশি অংশ দান করুন এবং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী ও বিজ্ঞ উপদেশমালা থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দিন। আমি আমার জন্য, তোমাদের জন্য ও তামাম মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাতের দু'আ করছি। তোমরাও তাঁর মাগফিরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

সালাত পৃথক এবং সালাত আদায়কারীর মর্যাদাও পৃথক

সালাত এমন কোন লৌহ ছাঁচ কিংবা শুকনো কাঠের মত নিষ্প্রাণ ও সীমিত বস্তু নয়, যার ভেতর সব কিছুই একই বরাবর ও একই রূপ হবে এবং প্রত্যেক মুসল্লী একই অবস্থানে ও একই পর্যায়ে থাকতে বাধ্য এবং সে এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষম। মুলত এ একটি বিরাট বড়, প্রশস্ত ও বিস্তৃত ময়দান যেখানে মুসল্লী (নামাযী) এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থা অবধি ও উত্থানের প্রাথমিক স্তর থেকে পরিপূর্ণতার স্তর এবং পরিপূর্ণতার স্তর থেকে সেই সব মনযিলে পৌঁছে যায় যা তার কল্পনারও অতীত। এর ভেতর মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান একে অন্যের থেকে অনেক ভিন্ন ও পৃথক এবং সকলের পর্যায়ও স্বতন্ত্র। অলসতা ও জিহালতে পূর্ণ সালাত হুযূরে কলব ও আত্মোপলব্ধিপূর্ণ সালাতের মুকাবিলা কিভাবে করতে পারে? ঠিক তেমনি সাধারণ মুসলমান এবং একজন আল্লাহওয়ালা 'আরিফ ও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির সালাত এব পাল্লায় কি করে রাখা যেতে পারে? অতঃপর এও জরুরী নয় যে, আজকের সালাত ও নামায আগামীকালের সালাত ও নামায কিংবা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পূর্বের সালাতের সদৃশ হবে এবং নামাযী চিরদিন একই মাপের ও একই মানের নামাযই আদায় করতে থাকবে।

এজন্যই কুরআন মজীদে সালাতের উল্লেখ আলোচনা দু'ভাবে করা হয়েছে ঃ একটি খারাপভাবে, আরেকটি খুব ভালভাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।" সূরা মা'উন ঃ ৪-৭ আয়াত

দ্বিতীয় কিসিমের সালাতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ -

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।"

সূরা মু'মিনূন ১-২ আয়াত ঃ

ঠিক এমনি রসূলুল্লাহ্ (সা) ও দু'ধরনের সালাতের উল্লেখ করেছেন ঃ তন্মধ্যে একটি খুশূ-খুযূ ও দরদভরা সালাত এবং আরেকটি অলসতা ও উপেক্ষায় ভরা ত্রুটিপূর্ণ সালাত। প্রথম প্রকারের সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্র রসূল (সা) বলেন ঃ

وقد توضأ فاحسن الوضوء (ثم قال) من توضأ وضوئى هذا ثم يصلى ركعتين لايحدث فيهما بشئ غفرله ما تقدم من ذنبه -

"তিনি (রসূলুল্লাহ) ওযূ করলেন এবং ভালভাবে ওযূ করলেন। (এরপর বললেন,) যে ব্যক্তি আমার মত ওযূ করবে ও দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে আর তার ভেতর অন্য কোন খেয়াল কিংবা ধারণা প্রশ্রয় দেবে না, তার বিগত জীবনের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" বুখারী ও মুসলিম, উছমান ইবন আফফান (রা) বর্ণিত।

'উকবা ইবনে 'আমের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কোন মুসলমান যখন ভালভাবে ও উত্তরূপে ওযূ করে, এরপর দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে এবং আপন দিল ও চেহারা উভয়টি সহ সালাতের প্রতি নিবিষ্টচিত্তে থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" মুসলিম;

দ্বিতীয় প্রকারের সালাত সম্পর্কে 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, "মানুষ সালাত থেকে মুক্ত হয় আর তার সালাতের এক-দশমাংশ পায়, কখনো নয় ভাগের এক ভাগ, কখনো এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ ও অর্ধেক পায়। (আবু দাঊদ ও নাসাঈ) তিনি এও বলেছেন যে, "সবচে' খারাপ ও নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে সালাত চুরি করে"। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ কিভাবে সালাত চুরি করে"? তিনি বললেন, "ঠিকভাবে রুকূ করে না, সিজদা করে না।" (মুসলিম)

সালাতে মানুষের মর্তবা ভিন্ন। একের সালাতকে অপরের সালাতের সঙ্গে কিয়াস করা যায় না। এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স)-এর সালাত ছিল সর্বোত্তম, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহ্র দাঁড়িপাল্লায় এর ওজন ছিল সর্বাধিক। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর সালাত ছিল অপর যে কারুক তুলনায় হুযূর আকরাম (সা)-এর

সালাতের সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ও অধিকতর কাছাকাছি। এজন্যই রসুলুল্লাহ (স) ইনতিকালের আগে রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে (আবূ বকরকে) নিজের জায়গায় ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) যখন হুযূর (সা)-এর এই রায় পেয়েও হযরত ওমর (রা)-এর পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলেন তখনও তিনি তাঁর রায় পুনর্ব্যক্ত করলেন এই বলে যে, আবূ বকরকে বল সালাতে ইমামতি করতে। অনন্তর সেই মুতাবিক নির্দেশ পালিত হয়। বুখারী।

এ ছাড়াও লোকের দর্জা ও মর্তবার সঠিক পরিমাপ সালাত দ্বারা যতটা হয় এতটা আর কোন আমল দ্বারা করা যায় না। যেমন 'ইল্ম, মেধা কিংবা কোন ইলমী খেদমত। সালাতই সেই সহীহ্-শুদ্ধ তুলাদণ্ড রায় দ্বারা মানুষের দীনের এবং ইসলামে তার মকাম (অবস্থানগত মর্যাদা) পরিমাপ করা যায়। ইসলামের ইতিহাসে যেই সব ব্যক্তিত্বের নাম ভাস্বর হয়ে আছে এবং যাঁদেরকে তাঁদের সমসাময়িকদের ভেতর বিশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাঁদের এই মকাম ও মর্তবা, এই স্থায়িত্ব ও অমরত্ব এই সালাতে বৈশিষ্ট্য হাসিল এবং একে ইহ্সানের দর্জায় পৌঁছুবার মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল।

যাকাত ঃ ইসলামের দ্বিতীয় রোকন

فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

"অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই।" সূরা তওবা ১১ঃ আয়াত

ইসলামের যাকাতে গুরুত্ব ও এর শরঈ মর্যাদা

কুরআন মজীদে সালাতের সঙ্গে যাকাতের উল্লেখ বিরাশি জায়গায় করা হয়েছে আর أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও" দ্বারা সমগ্র কুরআন ভর্তি। এছাড়াও وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ "তাঁরা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়" বলে তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একে ইসলামের বুনিয়াদী রোকনসমূহের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল; (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত দেওয়া; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানে সিয়াম বা রোযা পালন করা।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইসলাম কি বা ইসলামের পরিচয় কি? জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করো না। ফরয সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রমযানের সিয়াম পালন কর (বুখারী ও মুসলিম)।" যিমাম ইব্ন ছা'লাবা (রা)-র হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি একবার হুযূর আকরাম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কি এর নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করবেন এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করবেন? তিনি বলেন. "হ্যাঁ, ঠিক।"

এবিষয়ে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, তা গণনা করাও মুশকিল। এক কথায় তা অসংখ্য এবং এ বিষয়ে উম্মাহ্র ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে যে, যাকাত সালাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ও বংশানুক্রমে অব্যাহতভাবে এর ওপর আমল চলে আসছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়কে ইসলামের বিশুদ্ধতা ও এর কবুলিয়ত, এর হুকুম-আহ্কাম পালন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সন্ধি-সমঝোতা এবং মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের আলামত হিসেবে অভিহিত করেছেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা তওবা ঃ ৫ আয়াত

অন্যস্থানে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

"এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপ বর্ণনা করি।" সূরা তওবা ঃ ১১ আয়াত

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি লোকের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। যদি তারা তা করে তবে তারা তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার থেকে হেফাজত করে নিল, কেবল ইসলামের হক ছাড়া। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র ওপর; চাইলে হিসাব তিনি নিতেও পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদী ধারণা ঃ সকল বস্তুই আল্লাহর মালিকানাধীন

কুরআন মজীদ সমস্ত মানবীয় ব্যাপারগুলোকে আল্লাহ তা'আলায় সোপর্দ করে দিয়েছে এবং মানুষকে কেবল একটা জিনিসের যিম্মাদার বানানো হয়েছে আর সেই বস্তুটি হল মানসাবে খেলাফত অর্থাৎ খেলাফতের পদমর্যাদা কুরআন মুসলমানদেরকে কখনো এভাবে সম্বোধন করে ঃ

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتٰكُمْ -

"আর আল্লাহর ঐ সমস্ত সম্পদের ভেতর থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে যে সম্পদ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।" সূরা নূর ঃ ৩৩ আয়াত

কখনো বা এভাবে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ -

"আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।"

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৭

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এর পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যামান যে, এই সকল বস্তুসামগ্রীর প্রকৃত ওয়ারিস ও মালিক আল্লাহ তা'আলা। এজন্য মানুষ যদি কয়েকটি পয়সা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে তবে সে জন্য তার গর্ব ও অহংকারের কোনোই অধিকার নেই।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই।" সূরা হাদীদ ঃ ১০ আয়াত

মানুষের দিকে ধন-সম্পদের নম্বদ্ধকরণের গূঢ় রহস্য ও এর উপকারী দিকসমূহ

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও রহমত অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও করুণা মানুষের সঙ্গে এমনটি করে নি এবং ওই সব বিত্ত ও ধন-সম্পত্তি এবং মানুষের চেষ্টা-সাধনা ও কঠিন সংগ্রামের ফল ও ফসলগুলোকে কেবল আল্লাহ্‌র দিকে নিসবত করত মানুষকে এর থেকে মাহরূম করে নি। যদি এমটি হত তাহলেও এতে বিস্ময় প্রকাশ কিংবা টু-শব্দটি উচ্চারণের কিছু ছিল না। কিন্তু এর ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাস ও স্বভাবজাত আবেগ-উদ্দীপনা, শক্তিমত্তার প্রকাশ, প্রতিযোগিতার প্রেরণা, পাবার আনন্দ-স্বল্প কথায় বলতে গেলে সংক্ষেপে জীবনের সেই সেই অবস্থা ও আনন্দ থেকে মাহরূম হয়ে যেত যা সে তার চেষ্টার ফল এবং আপন শ্রম ও দৌড়-ঝাঁপের ফসল দেখে লাভ করে।

এ সেই প্রকৃতিগত আনন্দ ও স্বাদ যা একজন শিশু তার ঘরবাড়ি ও তার পিতামাতার জিনিসপত্রকে নিজের ভেবে লাভ করে। যদি মানুষ এই স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে মাহরূম হয়ে যায় তবে সে ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও ভালবাসা, কল্যাণকামিতা, এই সব মালামাল ও বিত্ত-সম্পদের হেফাজত এবং এসবের উন্নতির চিন্তা-ভাবনা থেকে মাহরূম হয়ে যিন্দেগী, তার সমগ্র কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা, সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার প্রেরণা ও মনোবল সে হারিয়ে ফেলবে যা মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতির জন্য অপরিহার্য। দুনিয়া একটা বিরাট কারখানায় পরিণত হবে যার ভেতর মানুষ তার মেশিনের বোবা বধির পার্টসের ন্যায় সচল ও সক্রিয় থাকবে বটে, তবে তার দিল্ বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না বিবেক -বুদ্ধি আর না থাকবে তার স্বাদ-আহ্লাদ ও মানসিক তৃপ্তি-সুখ।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বিত্ত -সম্পত্তের নিসবত বারবার মানুষের দিকে করেছেন, তার স্রষ্টা ও রিযিকদাতার দিকে নয়।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

"তোমরা নিজেদের ভেতর একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"যারা আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের পতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" সূরা বাকারা ঃ ২৬২ আয়াত

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়ে দেই তার ভেতর যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। " সূরা বাকারা ঃ ২৬৭

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا -

"তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিও না।" সূরা নিসা ঃ ৫ আয়াত

মোটকথা, কুরআন মজীদে এ ধরনের বহু আয়াত বিদ্যামান যে সব আয়াতে কেবল বিত্ত-সম্পদকেই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'আলা একে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে কর্জে হাসানা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে এবং তাঁরা বান্দাদের কল্যাণের জন্য মানুষ যা কিছুই ব্যয় করে তাই আল্লাহর নিকট 'কর্জে হাসানা'। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

-"কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।" সূরা বাকারা ঃ ২৪৫ আয়াত

যাকাতের এমন একটি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন যা প্রতিটি স্তরে ও প্রত্যেক যুগের সঙ্গে চলতে পারে।

ইসলামী সমাজ যখন আকীদাগত দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের মজবুতী, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ, আনুগত্য ও অনুসরণ, বদান্যতা ও আত্মোৎসর্গ এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অহং ও আমিত্ববোধ থেকে মুক্তির শেষ স্তরে উপনীত হল, তখন সমাজ-সোসাইটি বিস্তৃত পরিসর লাভ করল এবং এর ভেতর বিভিন্ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তর ও শ্রেণী কায়েম হয়ে গেল। মানব সমাজ নানা গোত্রে ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেল যাদের ভেতর মালদারও ছিল, ছিল গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও। এমন উদার দানশীল

ছিল যে, বদান্যতা-তাদের খাদ্য ও রুচি বরং বলা চলে, তাদের মেজায ও দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। কৃপণ ও হাত খাটো লোকও ছিল, মাঝামঝি ও ভারসাম্যের অধিকারী লোকও ছিল। একদিকে এমন সব ঈমানী শক্তির অধিকারী লোকও ছিল যারা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কুরবানী দিতে ও ত্যাগ স্বীকারেও পিছু হটত না, অবহেলায় যে কোন ত্যাগ তারা করতে পারত, কঠিন থেকে কঠিনতর, সমস্যারও তারা সমাধান করতে পারত। অপরদিকে এরূপ ঈমানী কমজোরী ও দুর্বলতার নমুনাও ছিল যা মুসলিম বিশ্বের দূরদরাজ এলাকায় এবং শেষ যুগের বংশধরদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলার এ ছিল এক বিরাট হেকমত ও রহমত যে, এরূপ বৈচিত্র্যমন্ডিত ও বিভিন্নমুখী সমাজের জন্য এর এমন একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিসাব নির্ধারণ করে দেন যার পরিমাণ ও সংখ্যা, উসূল (মূলনীতি) ও শর্তাবলী, আলামত ও চিহ্নসমূহ সব কিছুই পূর্ণতররূপে স্পষ্ট দেদীপ্যমান ও নির্দিস্ট। এ নিসাবের পরিমাণ এও বেশি নয় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ ব্যাপারে পেরেশান হয়ে উঠে। আবার এতটা কমও নয় যে, আমীর–উমরা ও ধনিক বণিক শ্রেণী এবং সাহসী ও সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তা অনুল্লেখ্য বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার এত এক বিরাট হেকমত ছিল যে, একে তিনি কারুর অভিমত কিংবা ব্যক্তিগত হিম্মত ও উৎসাহ–উদ্দীপনার ওপর ছেড়ে দেননি অথবা মানবীয় আবেগ–অনুভূতির কাছেও সোপর্দ করেন নি যার ভেতর উত্থাল–পাতাল ও ওঠানামা চলে সব সময়। একে আইন নির্মাতা, আলিম–উলামা' কিংবা শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের হাওয়ালাও করা হয়নি এজন্য যে, তাদের ওপরও পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন সম্ভব নয় এবং তারাও প্রবৃত্তির খেয়াল–খুশীর হাত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ নয়। এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকাতকে তার নিসাব ও পরিমাণসহ ফরয করা হয়েছে।

যাকাত কিসের ওপর ওয়াজিব এবং এর রিমাণ নির্ধারণের ভেতর হেকমত কী?

রসূলুল্লাহ্ (সা) যাকাতের পরিমাণও নিধারণ করে দিয়েছেন এবং সেসব বস্তুসামগ্রী ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন যেগুলোর ওপর যাকাত ফরয। তিনি এও বলে দিয়েছেন যে, যাকাত কখন ওয়াজিব হবে। তিনি এগুলো চার ভাগে ভাগ করেছেন এবং চার ভাগ এমন যে, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই সম্পর্কে রয়েছে। প্রথম ভাগ কৃষি ও বাগবাগিচা; দ্বিতীয় ভাগ পশুপাল (উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি); তৃতীয় ভাগ যেগুলোর ওপর অর্থনীতির গোটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সোনা-রূপা; চতুর্থ

ভাগ-ব্যবসার মালামাল, এর শাখা-প্রশাখা ও ধরন যাই হোক না কেন (যাদু'ল-মা'আদ থেকে সংক্ষেপিত)।

যাকাত বছরে একবার ফরয। অবশ্য বাগ-বাগিচা ও কৃষির ক্ষেত্রে এর পূর্ণ বছর তখন ধরা হবে যখন বাগ-বাগিচার ফলমূল ও ক্ষেতের শস্য পেকে যাবে এবং পূর্ণতর রূপ পাবে। আর প্রকৃত সত্য এই যে, এর চেয়ে অধিক ইনসাফ সম্ভবই ছিল না। যদি যাকাত প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে আদায় করতে হত তাহালে ধনীদের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর হতে পারত। আবার জীবনে যদি একবার ফরয হ'ত তাহলে নিঃস্ব গরীব ও অসহায় দুঃস্থদের জন্য তাও ক্ষতির কারণ হত। এদিক দিয়ে এর চেয়ে বেশি উপযুক্ত ও ভারসাম্যমূলক হুকুম আর কিছুই হতে পারত না যে, যাকাত প্রত্যেক বছরে আদায় করা হবে। যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে সাহেবে নিসাব বা মালিকে নিসাব -এর মেহনত ও চেষ্টা-সাধনা এবং তার সহজসাধ্যতা বা সামর্থ্য ও অসুবিধাকে সামনে রেখে। অনন্তর যেই বিত্ত-সম্পদ মানুষ আকস্মিকভাবে একেবারে হঠাৎ করেই পেয়ে যায় (উদাহরণত গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি) সে ক্ষেত্রে বছর অতিক্রমের অপেক্ষা করা হবে না এবং যেই মুহূর্তে সে তা পাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই এর এক-পঞ্চমাংশ তার ওপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে তা লাভ করতে স্বয়ং তার শ্রম ও প্রয়াসের ভূমিকা ছিল এবং এর জন্য সে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে সে ক্ষেত্রে তার ওপর একদশমাংশ প্রদান বাধ্যামূলক হবে। যেমন চাষবাস ও বাগ-বাগিচা প্রভৃতি। এর দ্বারা বোঝাবে সেসব চাষবাস ও কৃষি যা রোপণ ও বপনের কাজ সে স্বহস্তে করে, কিন্তু তাকে সেচ দিতে হয় না। কিম্বা এর জন্য তাকে কুয়াও খুঁড়তে হয় না আর সেচ যন্ত্র ও স্থাপন করার প্রয়োজন হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির পানি দিয়েই সেচকার্যের কাজ চালিয়ে দেন। তবে হ্যাঁ, যদি কোন লোক (ডোলের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায়) এতে পানি সেচ দেয় তবে উৎপন্ন শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি এমন কোন কাজ হয় যার বৃদ্ধি মালিকের শ্রমের ওপর নির্ভর করে, তার এন্তেজাম, দেখাশোনাম, তত্ত্বাবধান ও হেফাজত মালিকের যিম্মায় থাকে তবে সেক্ষেত্রে এরও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তার ওপর ওয়াজিব হবে। এজন্য যে, এতে তাকে ক্ষেত-খামারের থেকেও অধিক ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সব সময় তা দেখাশোনা করতে হয়। ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় কম দেখাশোনা করতে হয় এবং এতে অত সময় ও ব্যয় হয় না যতটা সময় ব্যয় হয় কোন দোকান-পাট, কল-কারখানা কিংবা কোম্পানী

দেখাশোনায়। তেমনি বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যেই শস্য উৎপন্ন হয় তা সেচকৃত জমিতে উৎপন্ন ফসলের তুলনায় অনেক বেশি ভাল ও সহজ হয়। তেমনি কোন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার উল্লিখিত ওই সব বস্তুসামগ্রীর তুলনায় অনেক বেশি সহজ। এক্ষেত্রে মালিককে কিছুই করতে হয় না। অনন্তর রৌপ্যের জন্য দু'শো দিরহাম এবং স্বর্ণের জন্য বিশ মিছকাল, খাদ্য-শস্য ও ফলমূলের জন্য পাঁচ ওয়াসাক (উটের পাঁচ বোঝার সমান), ভেড়া-ছাগলের জন্য চল্লিশটি ছাগল-ভেড়া, গরুর জন্য তিরিশ এবং উটের জন্য পাঁ টি নির্ধারণ করা হয়।[১]

যাকাতের ব্যয় খাত

যাকাতের ব্যয়ের খাতসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বারা'আতের নিম্নোক্ত আয়াতে বাতলে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

"সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলমানকে কিছু দিলে ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস আরও মজবুত হবার আশা আছে-যাকাত থেকে তাকে দেওয়া যায়), দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" সূরা তওবা ঃ ৬০ আয়াত

যাকাত ট্যাক্স কিংবা জরিমানা নয়

যাকাত সম্পর্কে এটা মনে রাখতে হবে যে, এটা ট্যাক্স, জরিমানা কিংবা সরকারী দাবি নয় বরং এটি সালাত ও সওমের মতই একটি স্থায়ী ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম। যাকাত প্রদান নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধন ও প্রশিক্ষণের একটি খোদায়ী ব্যবস্থা। এটি আদায় করার ক্ষেত্রেও নিজেকে বড় মনে করে কিংবা আমি দয়া করছি এই ভেবে এবং গর্ব ও অহংকার মনে করে নয় বরং

১. রসূল (স)-এর যমানায় এক মিছকাল একটি দীনারের সমান ছিল এবং এক দীনার দশ দিরহামের সমতুল্য ছিল। এদিক দিয়ে বিশ মিছকাল বা বিশ দীনার দু'শো দিরহারেম সমতুল্য হল। অধিকাংশ ভারতীয় আলিমের মতে সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য ও সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের সমতুল্য।

বিনয় সহকারে নম্র ও সদয়চিত্তের সাথে, আন্তরিকতার সাথে আদায় করতে হবে এবং নিজের পরিবর্তে যাকাত গ্রহণকারীকে উপকারী বন্ধু ভাবতে হবে। যাকাতের হকদারদেরকে যাকতা আদায়কারী নিজেই খুঁজে বের করবেন ও তাদের বাছাই করবেন। এর ইহতিমামও কাম্য। এটিও উত্তম বিবেচনা করা হয়েছে যে, একই স্থানের ধনী ব্যক্তিদের থেকে বেরিয়ে এসে যাকাত সেই এলাকার গরীবদের মাঝেই যেন বন্টিত হয়। অবশ্য সেখানে যদি যাকাতের হকদার পাওয়া না যায় তবে বাইরে দেওয়া যাবে। কুরআন মজীদে যাকাতকে সুদের (যা ইসলামে হারাম) একেবারে সমান্তরাল ও প্রতিপক্ষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, আর যাকাতের যে পরিমাণ প্রশংসা করা হয়েছে, ঠিক ততটাই সুদের নিন্দা করা হয়েছে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দান–খয়রাতে উৎসাহদান

নবী করীম (সা) তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে এবং তাঁর গোটা উম্মতকে এম-নতরো আখলাক ও এমনতরো চরিত্রের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন এবং সম্পদ ব্যয়ে উৎসাহিত করতে এমনই প্রভাবমণ্ডিত ও কার্যকর উপদেশ দিয়েছেন যা পড়ে মনে হয় যে, অতিরিক্ত ধন–সম্পদে বুঝি মানুষের কোনই হক বা অধিকার নেই। এসব হাদীস পাঠ করবার পর একজন মানুষ যখন তার জীবন পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই আরাম–আয়েশ, সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যও প্রাচুর্য দেখতে পায় তখন তার খুবই কষ্ট হয়। তখন তার প্রতিটি জিনিসই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে হয়। সুদৃশ্য পোশাক, রকমারি খানা; আরামদায়ক যানবাহন, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য তার কাছে অন্যায় ও অবৈধ হিসেবে ধরা পড়ে। অথচ এগুলো কেবল অনুপ্রেরণামূলক ব্যাপার, শরীয়তের হুকুম বা আইনের কথা নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)–এর আদর্শ এটাই ছিল।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَ
الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

" তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মর করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

সূরা আহযাব ঃ ২১ আয়াত

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি [রসূলুল্লাহ (সা)] বলেন যে যার কাছে আরোহণ করার মত একটি সওয়ারী অতিরিক্ত আছে সে তা তাকে দিয়ে দেবে যার একটিও নেই, যার কাছে এক বেলার নাশতা অতিরিক্ত আছে সে যেন তা তাকে দিয়ে দেয় যার কাছে নাশতা নেই। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের হাদীস!

তিনি এও বলেছেন যে, যার কাছে দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয়জনকে খেতে দেয় এবং যার কাছে তিনজনের খাবার আছে সে যেন এতে চতুর্থজনকে শরীক করে। (তিরমিযী)

তিনি বলেন ঃ সে আমার ওপর ঈমান আনেনি যে পেট ভরে খেয়ে ঘুমায় আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় অভুক্ত রাত কাটায় অথচ সে তা জানতে ।(ত্বাবারানী)

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, একজন লোক রসূল (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হল এবং বলতে লাগল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার পরিধানের বস্ত্র দিন।" তিনি তাকে বললেন যে, তোমার কি এমন কোন প্রতিবেশি নেই যার দু'জোড়া অতিরিক্ত কাপড় আছে? সে বলল, "একটার বেশি আছে।" তিনি বললেন, "এরপর আল্লাহ যেন তাকে ও তোমাকে জান্নাতে একত্র না করেন। " (তাবারানী)

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য এবং মানুষের প্রতি সববেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপনের গুরুত্ব

রসূলুল্লাহ (সা) মানুষের মর্যাদা এবং তার প্রয়োজন পূরণ, তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সমবেদনা জ্ঞাপনের মূল্য ও গুরুত্ব এত বেশি সমুন্নত করেছেন যে, এর চেয়ে সমুন্নত আর কোন মানদণ্ডের কল্পনা করাও অসম্ভব। এক্ষেত্রে যিনি এতটুকু গাফিলাতি করবেন তার অবস্থা হবে এমন যেমন হয় স্বয়ং আল্লাহ্র নাফরমানী করনেওয়ালার। বিখ্যাত হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাকে ডেকে বলবেন যে, আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি তো আমাকে সেবা কর নাই? সে বলবে যে, প্রভু হে! আমি কিভাবে তোমার সেবা করতাম অথচ তুমি জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন যে, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত, কিন্তু তুমি তার সেবা কর নাই! যদি তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করতে তাহলে তুমি আমাকে তার পাশে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চাইলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাও নাই। সে বলবে, প্রভু হে! আমি কিভাবে তোমাকে খাবার দিতাম; তুমি তো রাব্বু'ল-'আলামীন! আল্লাহ তা'আলা বলবেন যে, তোমার জানা নেই যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নাই। যদি তাকে খাবার খেতে দিতে সে খাবার আমার কাছেই এসে পৌঁছুতে। হে আদম তনয়! আমি তোমার নিকট পানি চাইলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে বলবে, প্রভু হে! তোমাকে আমি কি ভাবে পানি পান করাতাম, অথচ তুমি রাব্বুল-আলামনী। আল্লাহ তা'আলা বলবেন যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চাইল, অথচ তুমি তাকে পানি পান করালে না। যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তা আমার কাছে পেতে।" (মুসলিম)

এর চূড়ান্ত ছিল এই আর সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা ও আদল-ইনসাফের এর চেয়ে বড় নজীর আর কিছু হতে পারে না যে, তিনি বলেন,

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

' তোমাদের ভেতর কেউই মু'মিন হতে পারে না, পারবেনা যতক্ষণ না তার ভাই-এর জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"

সিয়াম (রোযা) ঃ ইসলামের তৃতীয় রোকন

সিয়ামের হুকুম ও এতদসম্পর্কিত আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালনের হুকুম মুসলমানদের জন্য নাযিল করেছেন। সিয়াম বা রোযা হিজরতের পর তখন ফরয করা হয়েছে যখন বিপদ-আপদ ও নির্যাতন-নিপীড়নের কালো মেঘ কেটে গেছে, সমস্যা -সংকটের কাল পেরিয়ে গেছে, মদীনার বুকে মুসলমানরা নিশ্চিন্তে তৃপ্তির নিংশ্বাস ফেলতে পারছে এবং তাদের জীবন প্রশস্ততা ও আরামের সাথে কাটতে শুরু করেছে। সম্ভবত এমনটি এজন্য হয়েছে যে, যদি পেরেশান হাল কালে সিয়ামের হুকুম নাযিল হত তাহলে বহু লোকই একে মজবুত অবস্থায় রোযাকে অর্থনৈতিক দৈন্য-দশা ও সংকটময় পরিবেশের ফসল হিসাবে গণ্য করত যে অবস্থা ছিল মক্কায় এবং এও মনে করত যে, সিয়াম কেবল ফকীর-মিসকীন, বিপদগ্রস্ত ও নিপীড়িত মজলুমদের জন্যই, ধনী ও প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্তবান এবং বাগ-বাগিচা ও সহায়-সম্পত্তির মালিক এর থেকে মুক্ত। এ ছাড়াও সিয়াম-এর ফরযিয়ত তথা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত আয়াত সেই সময় নাযিল হয় যখন ইসরামী আকীদা-বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয় মানসে বেশ ভালভাবে ও পাকাপোখ্তভাবে আসন গেড়ে বসেছে এবং সালাতের সঙ্গেও তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পর্কই কেবল নয়-গভীর হৃদ্যতা ও ভালভাসা ও জন্মে গেছে, সমস্ত মুসলামন যখন আহকামে ইলাহী ও শরঈ আইন-কানুনের সামনে নিজেদের মাথা পেতে দিতে প্রতিটি মুহূর্তে তৈরী মনে হচ্ছিল যেন তারা এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। যেই আয়াতের দ্বারা সিয়াম ফরয ঘোষিত হয় তা ছিল এই ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ

عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا
يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ। তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার! নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের ভেতর কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া—একজন অভাবগ্রস্তকে অন্ন দান করা। যদি কেউ স্বতস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ন হয়েছে। সুতরাং তোমাদের ভেতর যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করবে আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

সূরা বাকারা ঃ ১৮৩–৮৫ আয়াত

এই আয়াত যেই আয়াতে প্রথমবার সিয়াম তথা রোযা ফরয ঘোষিত হয় সেই শুষ্ক আইনের ন্যায় ছিল না যা কেবল সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যে সম্বন্ধে সমাজের একজন সদস্য ও হুকুমতের মধ্যে কায়েম হয়। এই আয়াত ঈমান ও আকীদা, বুদ্ধি ও বিবেক, হৃদয় ও আবেগ সব কিছুকে এক সঙ্গে একই সময় আপীল করে, আবেদন জানায় এবং পূর্বোক্ত সমস্ত কিছুকেই খোরাক যোগায় এবং আইনের প্রচলন ও প্রয়োগের

জন্যই শুধু নয়-খুশী মনে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যও পরিবেশ অনুকূল করে তোলে। এটি কুরআনুল করীমের দাওয়াতের মূলনীতি, মনস্তত্ত্ব ও প্রজ্ঞামণ্ডিত আইন তৈরির এক অনস্বীকার্য মু'জিযা। تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

"প্রশংসাময় বিজ্ঞ প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (এই কুরআন)।"

আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোককে যারা এই আইনের মুকাল্লাফ অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে ও যাদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য "হে মুমিনগণ!" বলে সম্বোধন করেছেন এবং এভাবেই যেন তাদেরকে প্রথম থেকেই ওই সব আহকাম পালনের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন যা তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া হবে, চাই কি তাদের মনের ওপর তা যতই ক্লেশকর ও দুর্বহই হোক। এজন্য যে, ঈমানের এটাই চাহিদা ও দাবি। যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান এনে থাকে, তাঁকে নিজের উপাস্য প্রভু-প্রতিপালক, আদেশ-নিষেধের মালিক, অনুসরণ ও আনুগত্যের উপযুক্ত বলে মেনে নিয়ে থাকে, স্বীয় বাগডোর তাঁর হাতে তুলে দিয়ে থাকে এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভালোবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে তবে নির্দ্বিধায় তাঁর প্রতিটি আদেশ, প্রতিটি আইন-কানুন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি দাবির সামনে এতটুকু শব্দ না করে তার মাথা পেতে দেওয়া উচিত, দেওয়া কর্তব্য।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا -

"মুমিনদের উক্তি তো এই – যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম।" সূরা নূরঃ ৫১ আয়াত

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" সূরা আহযাবঃ ৩৬ আয়াত

يَٓا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

" হে মু'মিনগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দেবে।" সূরা আনফাল ঃ ২৪ আয়াত

এটা এমন কোন জিনিস নয় যার উদ্দেশ্যই হল অহেতুক মানুষকে কষ্ট দেওয়া কিংবা পরীক্ষার ভেতর ফেলা। সিয়াম বা রোযা কেবল রিয়াযত, তরবিয়ত, ইসলাহ তথা সংস্কার-সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য। এটি মূলত

নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে মানুষ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে এভাবে বের হয় যে, কামনা-বাসনার লাগাম থাকে তার হাতে। কামনা-বাসনা তার ওপর তখন আর কর্তৃত্ব করে না বরং সেই তখন কামনা-বাসনার ওপর কর্তৃত্ব করে। সে যখন কেবল আল্লাহর নির্দেশে মুবাহ্ ও পাক-পবিত্র জিনিস পরিত্যাগ করে তখন নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা সে না করবে কেন? যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি, তীব্র ক্ষুধায় পাক-পবিত্র ও উপাদেয় খাবার কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীতে ছাড়তে পার, সে হারাম ও অপবিত্র বস্তুর দিকে চোখ তুলে চাওয়াকে কিভাবে মেনে নিতে পারে? আর এটাই لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ এর মমার্থ। এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, মাসের গণা-গণতি কয়েকটি দিনকে বেশি মনে কর না। এতো হাতে গণা কয়েকটি দিন বৈ নয় যা স্বাভাবিক নিয়মেই আসে আর দেখতে দেখতে ফুরিয়েও যায়। এ ছাড়া এই একটি মাসের (যার কেবল দিনের বেলায় সিয়াম পালিত হয়) সঙ্গে গোটা বছরের রাত্র-দিনের সম্পর্কই-বা কতটুকু যা আরাম-আয়েশ, স্বস্তি ও অবসরের ভেতর দিয়ে গুজরে যায়?

সিয়াম (রোযা) এর বৈশিষ্ট্য ও ফাযাইল

ইসলাম সিয়াম বা রোযার যে চিত্র পেশ করেছে তা আইনগত এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ, উপকারিতার সর্বাধিক নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং এর ভেতর প্রবল পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল মহাপ্রভুর হেকমত ও অভিপ্রায় পূর্ণতরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

"তিনি কি অবহিত হবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বাধিক অবহিত।" সূরা মুল্কঃ ১৪ আয়াত

তিনি গোটা মাস (আর এই রমাযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে) অব্যাহতভাবে মাসভর সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন যার দিবাভাগে সিয়াম পালন তথা রোযা রাখার হুকুম আর রাত্রি বেলা খানাপিনার অনুমতি রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং নেকী দশ গুণ থেকে সাত শ' গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, একমাত্র সিয়াম এর ব্যতিক্রম, কেননা তা বিশেষভাবে আমার জন্য আর আমিই এর বিনিময় প্রদান করব। আমার খাতিরে সে তার পানাহার ও আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা সব

কিছুই পরিত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টো খুশীর বিষয় রয়েছে ঃ একটি ইফতারের সময় আর অপরটি আপন প্রভু-প্রতিপালকের সঙ্গে মোলাকাতের সময়। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মেশ্ক -এর চেয়েও অধিক উত্তম ও পাক-পবিত্র।

হযরত সহল ইবন সা'দ (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রায়্যান। এই দরজা থেকে কেবল রোযাদারকে ডাকা হবে। যারা রোযাদার কেবল তারাই এই দরজা দিয়ে এতে প্রবেশ করবে আর যারা এতে প্রবেশ করবে তারা কখনো পিপাসার্ত হবে না।

রমাযানকে সিয়ামের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হল কেন?

আল্লাহ তা'আলা সিয়ামকে রমাযান মাসে ফরয করেছেন এবং উভয়কে একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত করেছেন। আর এই দুই বরকত ও সৌভাগ্যের সম্মিলন বিরাট হেকমত ও গুরুত্ব বহন করে। এর পেছনে সবচে' বড় কারণ হল এই যে, রমাযানই সেই মাস যেই মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট মানবতার ভাগ্যে সুবহে সাদিক জুটেছে। এজন্য এটাই সমীচীন ছিল যে, যেভাবে সুবহে সাদিকের উদয় সিয়ামের সূচনা ক্ষণের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি এই মাসকেও যে মাসে এক দীর্ঘ ও অন্ধকার রাত্রির পর মানবতার সুবহে সাদিকের আবির্ভাব ঘটে, পূর্ণ মাসের সিয়ামের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। বিশেষত সেই সময় যখন আপন রহমত, বরকত, রূহানিয়াত ও বাতেনী নিসবতের দিক দিয়েও এই মাস ছিল সমস্ত মাসের ভেতর উত্তম। সেদিক দিয়েও স্বাভাবিকভাবেই সে এর হকদার ছিল যে, এর দিনগুলো সিয়ামের দ্বারা মণ্ডিত এবং রাতগুলো ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

সিয়াম এবং কুরআনুল করীমের ভেতর খুব গভীর সম্পর্ক ও বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে এবং এজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের খুব বেশি ইহতিমাম করতেন। আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র রসূল (সা) সবচে' বেশি দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমাযান মাসে যখন জিবরীল (আ) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সে সময় তাঁর দানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেত। জিবরীল (অ) রমাযানের প্রত্যেক রাত্রেই হুযুর আকরাম (সা)-এর কাছে আসতেন এবং কুরআন মজীদ শুনতেন ও শোনাতেন। জিবরীল আমীন সে সময় যখন তাঁর সাক্ষাতের জন্য কাছে আসতেন, তাঁকে তখন দানশীলতা, মহানুভবতা ও সৎকর্মে দ্রুতগামী বায়ুর

চেয়েও দ্রুতগামী দেখা যেত (বুখারী-মুসলিম)।

ইবাদতের বিশ্বব্যাপী মৌসুম এবং নেক আমলের সাধারণ উৎসব

আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসকে ইবাদত-বন্দেগীর বিশ্বব্যাপী মৌসুম এবং নেক আমলের কাল বানিয়ে দিয়েছেন যার ভেতর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত মুসলমান, আলেম ও জাহেল, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, কম হিম্মত ও বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী শামিল হয়। এটা ধনীর প্রাসাদ ও গরীবের ঝুঁপড়ী উভয় খানেই উজ্জ্বলতররূপে দেখতে পাওয়া যাবে। এর ফল এই যে, কোনো লোক যেমন আপন খেয়াল-খুশী বা মতামতকেই বড় মনে করে না, তেমনি রোযার জন্য উভয়ের নির্বাচনের ভেতর কোনরূপ নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় না। এমন প্রতিটি লোক আল্লাহ্ পাক যাকে দু'চোখ দিয়েছেন—মুসলিম বিশ্বের বিশাল-বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্বত্র ও সর্বস্থানে এর জালাল ও জামাল তথা এর মর্যাদামণ্ডিত প্রভাব ও সৌন্দর্য সে নিজেই দেখতে পাবে। মনে হয় সমগ্র মুসলিম সমাজের ওপর যেন নূরানী আলো ও স্বকীনার (পরিতৃপ্তির) সুবিস্তৃত শামিয়ানা ছায়া বিস্তার করে আছে। যে সব লোক সিয়াম পালন তথা রোযা রাখার ব্যাপারে কিছুটা অলস ও গাফিল তারাও সাধারণ মুসলমানদের থেকে পৃথক বা একঘরে হয়ে যাবার ভয়ে সিয়াম পালনে বাধ্য হয় এবং কোন কারণে যদি রোযা না রাখে তবে তারা লুকিয়ে, চুপিসারে ও লজ্জা-শরমের সাথে খায়। কেবল হাতে গোনা কিছু ধর্মদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ এর ব্যতিক্রম যারা প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষেও এই লজ্জাজনক কাজটি করতে কোনরূপ লজ্জা-শরম বোধ করে না কিংবা সেই সব রোগী ও মুসাফির যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'যূর বা অক্ষম বিবেচিত। এটি এক সামষ্টিক ও বিশ্বব্যাপী সিয়াম যদ্দ্বারা আপনা-আপনিই এমন একটি উপযোগী মিষ্টিমধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেই পরিবেশে রোযা আসান মনে হয়, মনটা নরম হয়ে যায় এবং লোকে ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য এবং পারস্পরিক সমবেদনা ও সহানুভূতিমূলক বিভিন্ন কাজের দিকে ঝুঁকে যায়।

রাত্রির শেষাংশে উঠে সাহরী খাওয়া

রাত্রি বেলা সুবহে সাদিকের আগেভাগেই (সিয়াম পালনের দরকারী শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন রোযাদারকে খুব বেশী কাহিল করে না ফেলে সেজন্য) কিছু খেয়ে নেওয়া হয়—শরীয়তের পরিভাষায় একে 'সুহূর' এবং উপমহাদেশে একে "সাহরী" বলে। সাহরী খাওয়া সুন্নত এবং সাহরী গ্রহণকে

উৎসাহিতও করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং মুসলমানদের জন্য একে সুন্নত হিসেবে অভিহিত করেছেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "সাহরী খাও, কেননা এতে বরকত নিহিত আছে।"

হযরত 'আমর ইবনু'ল-আস (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আমাদের ও কিতাবীদের রোযায় কেবল এই সাহরীর পার্থক্য রয়েছে।"

তিনি ইফতার গ্রহণে বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন এবং একে ফেতনা-ফাসাদের আলামত ও কিতাবীদের চরমপন্থী দীনদার লোকদের চিহ্ন বলে অভিহিত করেছেন। সুহায়ল ইবনে সা'দ (রা) রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "যতদিন মানুষ ইফতার গ্রহণে তাড়াতাড়ি করবে ততদিন তারা কল্যাণের ভেতর থাকবে।"

হুযূর (সা) -এর অভ্যাস ছিল মাগরিবের সালাতের পূর্বেই ইফতার করতেন। থাকলে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে তিনি ইফতার করতেন, না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার পর্ব সারতেন। আর তাও না পেলে অগত্যা শুধু পানি দিয়েই ইফতার সারতেন। ইফতারের সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اللهم لك صمت و على رزقك افطرت

" হে আল্লাহ! তোমারই জন্যে আমি রোযা রেখেছিলাম আর তোমার প্রদত্ত রিযিক দিয়েই আমি ইফতার করছি।"

আরও বলতেন ঃ

ذهب الظماء و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء الله تعالى

"পিপাসা মিটে গেছে, গ্রন্থি ও শিরা-উপশিরাগুলো হয়েছে সিক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা চাহেত পুরস্কার হয়েছে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত।"

সিয়ামের রূহ এবং এর হাকীকতের হেফাজত

ইসলামী শরীয়ত সিয়ামের প্রকৃতি ও বাহ্যিক আকার-আকৃতিকেই যথেষ্ট জ্ঞান করে নি বরং এর হাকীকত ও রূহের দিকেও পূর্ণ মনোযোগ দান করেছে। সে কেবল খানাপিনা ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকেই হারাম বা নিষিদ্ধ করেনি বরং এমন প্রতিটি জিনিসকেই হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যা সিয়ামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী এবং এর হেকমত, এর রূহানী ও নৈতিক উপকারিতার পক্ষে ক্ষতিকর। ইসলামী শরীয়ত সিয়ামকে আদব, তাকওয়া, দিল ও যবানের হেফাজত ও পাক-পবিত্রতার লৌহপ্রাকার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আল্লাহর রসূল

(সা) বলেনঃ সিয়াম পালনরত অবস্থায় তোমরা কেউ কটুকাটব্য ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করবে না, ঝগড়া করবে না। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় কিংবা তোমার সঙ্গে লড়াই -ঝগড়া করতে উদ্যত হয় তবে তাকে বলে দেবে যে, আমি রোযাদার। তিনি আরও বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি (সিয়ামরত অবস্থায়) মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কাজ ছেড়ে না দেয় আল্লাহ তা'আলার তার পানাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই।" যেই সিয়াম তাকওয়া ও পাক-পবিত্রতার রূহ থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত তার উদাহরণ এমন আকৃতি যার সার-বস্তু বলতে কিছু নেই, এমন এক দেহ যার ভেতর প্রাণ নেই। হাদীসে বলা হয়েছে যে, এমন বহু রোযাদার আছে যার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্টভোগ ছাড়া আর কোন লাভ হয় না এবং বহু তাহাজ্জুদগোযার আছে যার বিনিদ্র রজনী যাপন ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সিয়াম হচ্ছে (আত্মরক্ষার নিমিত্ত) ঢাল বিশেষ যতক্ষণ না তা ফেড়ে ফেলা হয়।

ইসলামী সিয়াম কেবল নঞর্থক কাজ ও বিধি-বিধানের নাম নয় যাতে কেবল খানাপিনা, পরনিন্দা (গীবত), চোগলখুরী, ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ নিষিদ্ধ। এতে অনেক পজিটিভ বিষয় ও বিধানও রয়েছে। এ ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, যিক্র-আযকার, তসবীহ-তাহলীল, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সমবেদনা প্রকাশ, অপরের কল্যাণ কামনা এবং দরিদ্রের প্রতি প্রতিপালনের হাত বাড়িয়ে দেওয়ারও মৌসুম। আল্লাহ্র রসূল (সা) বলেনঃ এ মাসে যে কেউ একটি নেক আমল সহকারে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করবে সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল, আর যে এই মাসে একটি ফরয আদায় করল সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। এই মাস সবরের মাস আর সবরের বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। এ মাস পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের মাস।

যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে এবং রোযাদারের ছওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের ভেতর তারাবীহ্র হেফাজত এবং এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দানের প্রেরণাও সৃষ্টি করেছেন। তারাবীহ সালাত হুযূর (সা) থেকে প্রমাণিত। কিন্তু তিনি তিন দিন আদায় করার পর এই আশংকায় তা ছেড়ে দেন যে, না জানি তা উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যায় এবং তা তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ সবগুলোই রমাযানকে ইবাদত-বন্দেগীর সাধারণ উৎসবে পরিণত

করেছে, পরিণত করেছে কুরআন তেলাওয়াতের মৌসুমে এবং নেককার, মুত্তাকী, ইবাদতগুযার ও সংকর্মশীল বুযুর্গ বান্দাদের অনুকূলে সবুজ শ্যামল বসন্তে। এ সময় এই উম্মতের দীনী জযবা, ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং রমাযানে তওবাহ ও ইস্তিগফার, আল্লাহ্র প্রতি আত্মনিবেদন ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, কৃত গোনাহ্র দরুন লজ্জানুভূতি এবং সৎকর্মের প্রেরণা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব পরম তুঙ্গে উন্নীত হয়।

ই'তিকাফ

রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফও বিরাট ছওয়াবের কাজ। এটি রসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি প্রিয় সুন্নত এবং রমাযানের উপকারিতা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পূর্ণতা হাসিলের মাধ্যমও বটে।

ই'তিকাফরত অবস্থায় সালাত, তেলাওয়াত, আল্লাহ্র যিক্র, তসবীহ (সুবহ'নাল্লাহ বলা), তাহ'মীদ (আলহ'মদুলিল্লাহ বলা), তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা), তওবাহ ইস্তিগফার এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ শরীফ পাঠে মশগুল থাকা মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সা) সব সময় ই'তিকাফ করতেন এবং মুসলমানরা সর্বত্র ও প্রত্যেক যুগে এর নিয়মিত অনুসরণ করেছেন। অনন্তর তা রমাযানের প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়েছে এবং সুন্নতে মুতাওয়াতির-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) রমাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করতেন এবং ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। অতঃপর তাঁর তিরোধানের পর নবী সহধর্মীনিগণ এই ই'তিকাফ অব্যাহত রাখেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক রমাযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইনতিকাল করেন সেই বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

ই'তিকাফ অবস্থায় মানবীয় প্রয়োজনসমূহ (যেমন পেশাব, পায়খানা, ফরয গোসল) ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। ওযূ করতে হলে মসজিদের সীমার ভেতর থেকেই করতে হবে।

লায়লাতু'ল-কদর বা শবে কদর

কুরআন পাকে ও হাদীস শরীফে লায়লাতু'ল-কদরের ফযীলত বিরাট গুরুত্ব

সহকারে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(তরজমা) "আমি ইহা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে (অর্থাৎ লায়লাতু'ল-কদরে); আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাত্রে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রভু প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি; সেই রাত্রি উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি'স-সালাম-এর বাণী ঃ কদরের রাত্রে যে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে ইবাদত করবে তার বিগত জীবনের সকল গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার হেকমত ও রহমতের কারণে লায়লাতু'ল-কদরকে রমাযানের শেষ দশকের ভেতর প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যাতে মুসলমানরা এর অনুসন্ধানে থাকে, তাদের আগ্রহ ও হিম্মত বৃদ্ধি পায় এবং তারা সকলেই এর শেষ রাতগুলো একে পাবার লোভে সালাত, ইবাদত, দু'আ ও মুনাজাতের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করে যেমনটি রসূল আকরাম (সা)-এর অভ্যাস ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রমাযানের শেষ দশক শুরু হলেই রসূলুল্লাহ (সা) গোটা রাত জেগে কাটাতেন এবং নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন ও কোমর বেঁধে লেগে যেতেন ইবাদত -বন্দেগীতে। (বুখারী ও মুসলিম)

অধিক সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, লায়লাতু'ল-কদর রমাযানের শেষ দশকেই এবং এরও শেষ সাত দিনে ও বেজোড় রাতগুলোতে। ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সাহাবাদের ভেতর কাউকে কাউকে শেষ সাতদিনের স্বপ্নের মাধ্যমে লায়লাতু'ল-কদর দেখানো হয়েছিল। এতে রসূল (সা) বলেন যে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্নের বেশির ভাগ শেষ সাত দিন সম্পর্কে। অতএব যারা একে তালাশ করতে চায় তারা যেন শেষ সাত দিনের ভেতরই তালাশ করে।" (বুখারী ও মুসলিম) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রসূলুল্লাহ (সা) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ ও নির্জন বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন যে, লায়লাতু'ল-কদর রমাযানের শেষ দশকেই তালাশ কর।" (বুখারী ও মুসলিম) হযরত আয়েশা (রা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন : "আল্লাহ্র রসূল (সা) বলতেন যে, লায়লাতু'ল -কদর রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর!" (বুখারী শরীফ)

ঈদের চাঁদ উঠতেই রমাযান শেষ

দিন ফুরোতে দেরী হয় না। সময়ের হিসেবে ২৯-৩০ দিন এমন কিইবা

সময়? ইবাদত ও রূহানিয়াতের প্রতি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও লোভের পূর্ণ পরিতৃপ্তি আসতে এখনও ঢের বাকী। আল্লাহ্‌র বান্দাদের যবানে هل من مزيد আরও চাই, আরও আছে কি? এই ধ্বনি। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল, সাধারণ লোকদের মাঝেও যখন সিয়ামের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে চলেছিল–ঠিক এমনি মুহূর্তে পশ্চিমাকাশে শওয়ালের চাঁদ উঁকি মারল আর সেই সাথে রমাযান মুসলমানদের মাঝ থেকে বিদায় নিল। সেই সাথে ওয়াদা করে গেল আগামী বছর পুনরাগমনের। ঈদের চাঁদ উঠল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধৈর্যের স্থলে ধৈর্যমণ্ডিত কৃতজ্ঞতা এসে দেখা দিল। আল্লাহ্‌র এক মেহমান ও বার্তাবাহক বিদায় নিল, আগমন ঘটল আরেক মেহমান ও বার্তাবাহকের। সেও ছিল এক হুকুম আর এও আরেক হুকুম। আজকের দিনটি অবধি দিনের বেলায় পানাহার ছিল হারাম, আর আজ (ঈদের দিন) পানাহার না করাই হারাম। গতকাল পর্যন্ত দিনের বেলা পানাহার করা ছিল গোনাহ আর আজ পানাহার না করাই হবে গোনাহ।

হজ্জ ঃ ইসলামের চতুর্থ রোকন

"এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও; ওরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে ও সব রকমের ক্ষীণকায় উটের পিঠে, আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোয় হাজির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন ওর ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও। এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।" সূরা হজ্জ্২৭,২৮ ও ২৯ আয়াত;

হজ্জ ইসলামের চতুর্থ রোকন। যদি কোন লোক হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও হজ্জ না করে তবে তার জন্য কুরআন শরীফ ও হাদীস পাকে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যদ্দ্বারা আশংকা হয় যে, সে ইসলামের গণ্ডী এবং মুসলমানদের দল থেকে খারিজ না হয়ে যায়। এই ফরয নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে আদায় করা হয় অর্থাৎ চন্দ্রে বছরের শেষ মাস যিল হজ্জের ১০ তারিখে মক্কা মু'আজ্জমার ঐতিহাসিক আরাফাত ময়দানে এই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।

কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী এবং বালাদু'ল-আমীনের সঙ্গে এর সম্পর্ক

হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাকের বাবেল শহরের একজন বিরাট পুরুত ঠাকুরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন যার পেশাই ছিল মূর্তি নির্মাণ। শহরের সবচে' বড় মন্দিরের সে ছিল পূজারী ঠাকুর। সুতরাং বিশ্বাস ও পেশা এই উভয় দিক দিয়েই ইবরাহীম (আ)-এর পিতা এই মন্দিরের সাথে ছিল জড়িত। এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। কেননা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস যখন পেশার সঙ্গে এবং দীনী জযবা তার আর্থিক মুনাফার সঙ্গে মিলে যায় এবং উভয়ই যখন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে তখন সংকট ও জটিলতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। এই কঠিন ও অন্ধকার পরিবেশে এমন কোন জিনিস ছিল না যা ঈমান ও তাকওয়াকে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং এই শেরেকী ও মূর্তিপূজা-সর্বস্ব মূর্খতা ও বোকামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু এই কল্‌ব-ই সলীম, (শান্ত ও তৃপ্ত হৃদয় : এখানে হযরত ইবরাহীম আ)-এর কথাই ছিল ভিন্ন যাকে নবুওত ও নতুন এক পৃথিবী নির্মাণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। "আর আমি তো এর আগে ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম সৎ পথের জ্ঞান এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবহিত।" সূরা আম্বিয়াঃ ৫১

তিনি তাঁর বিদ্রোহ সেই পর্যায় থেকে শুরু করেন যেখানে কোন কোন সময় পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লবের অতিক্রমও সহজ হয় না। এটা ঘরোয়া ও পারিবারিক যিন্দেগীর পর্যায়, সেই ঘরের পর্যায়ে যেখানে মানুষ জন্ম নেয়, লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়, যৌবনে উপনীত হয় এবং সফল যেখানে তার জন্ম ও বর্ধন। এরপর সেই সব বিষয় সামনে এসে উপস্থিত হয় যে সব বিষয় কুরআন মজীদ তার পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও আলংকারিক ভাষায় অতুলনীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে। সে সবের ভেতর হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙা, পূজারীদের এতে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হওয়া, বিস্ময় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ এবং এই বিদ্রোহী ও উৎসাহদীপ্ত যুবকের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা, তাঁর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা, অতঃপর সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুকূলে শীতল ও শান্তিদায়ক হওয়া, অত্যাচারী বাদশাহ্‌র সামনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অলংকারিক ভাষায় বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

এই অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহের ফলে গোটা শহর তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। সমগ্র সমাজ তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তৎকালীন হুকুমত তাঁর পেছনে লাগে, তাঁকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি এর কোনটারই পরওয়া করেন না, এর প্রতি আদৌ গুরুত্ব দেন না। মনে হচ্ছিল যেন তিনি এসবের প্রতীক্ষা করছিলেন। ফলাফল যে এমনটি দাঁড়াবে তা আগে থেকেই যেন তিনি আশা করেছিলেন। এরপর তিনি

ঠাণ্ডা মাথায় ও প্রশান্ত মনে খুবই খুশী-খোশালীতে হিজরত করেন। এজন্য তিনি নিশ্চিন্ত যে, তাঁর আসল পুঁজি অর্থাৎ তাঁর ঈমান-রূপ সম্পদ তাঁর হাতে। তিনি একেবারে একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, বন্ধুহীন স্বজনহীন সফর করেন। এই সফরে সর্বত্র মানুষের একই রূপ দেখতে পান; সেই একই মূর্তিপূজা, শির্ক, জিহালত ও মূর্খতা এবং কামনা-বাসনার উষ্ণ বাজার যা তিনি পেছনে ফেলে চলেছিলেন, সর্বত্র এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটে।

তিনি মিসরে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে বিরাট পরীক্ষা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হন ও আপন স্ত্রীকে, যাঁর ওপর মিসর বাদশাহ্র কুদৃষ্টি পড়েছিল, নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মিসর থেকে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি সিরিয়া পৌঁছেন। এখানকার আবহাওয়া তাঁর মনে ধরে এবং সেখানেই তিনি বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তৌহিদের দিকে আহ্বান এবং মূর্তিপূজার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনের কাজ সেখানে তিনি পুনরায় শুরু করেন। সিরিয়া ছিল উর্বর, সবুজ শস্য-শ্যামল, আহার্য দ্রব্যে ও ফলমূলে ভরা, সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। বসবাসের জন্য জায়গাটা ছিল খুবই অনুকূল ও পছন্দনীয়। কিন্তু সত্বরই এমন এক ভূখণ্ডের দিকে গমনের জন্য তিনি আদিষ্ট হন–সবুজ ও শস্য শ্যামলিমার দিক দিয়ে যে ভূখণ্ড সিরিয়ার একেবারেই বিপরীত। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিজের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কোন হক বা অধিকার আছে বলে মনে করতেন না পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডকেই কিংবা কোন দেশকেই তিনি নিজের ভাবতেন না এবং কোন দেশের সঙ্গেই তিনি নিজের ভাগ্যকে জড়িত করেন নি। তিনি ছিলেন হুকুমের চাকর এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব চোখ বুঁজে পালন করতেন। সমগ্র পৃথিবীটাকেই তিনি তাঁর স্বদেশ এবং গোটা মানবতাকেই তাঁর নিজ পরিবার জ্ঞান করতেন। তিনি হুকুম পান আপন স্ত্রী বিবি হাজেরা এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে এখান থেকে হিজরত করার, এমন এক উপত্যকা এবং এমন এক ভূখণ্ডে পৌঁছুবার যার চতুর্দিকে ধূসর উর্বর পাহাড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেখানকার আবহাওয়া ও মৌসুম খুবই কঠিন, পানি নেই কোথাও এবং চতুর্দিকে জনমানবহীন এক ভীতিকর শূন্যতা। যেখানে এমন কোন সমব্যথী নেই, নেই শোকে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ যার সঙ্গে মন খুলে দু'দণ্ড কথা বলা যায়, কথা বলে মনের ভার কিছুটা হাল্কা করা যায়, স্বস্তি পাওয়া যায়। তিনি নির্দেশ পান যে, আপন দুর্বল ও অসহায় স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে আল্লাহ্র ভরসায় এবং কেবল তাঁরই নির্দেশ পালনার্থে এখানে রেখে এখান থেকে চলে যাও। সন্তুষ্ট চিত্তে এতটুকু মুখ ভার না করে, ভয়-ভীতি কিংবা বিষণ্নতাকে কাছে ভিড়তে না দিয়ে মনে কোনরূপ ব্যথা না রেখে যাও। অটুট সংকল্প ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি যেন দুর্বল না হয়ে যায়, আল্লাহ্র ওয়াদাতে যেন সন্দেহ বা সংশয় সৃষ্টি

না হয় বরং এর পরিবর্তে মানব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্বাভাবিক কার্যকারণের বিরোধিতা, উপায়-উপকরণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ঈমান বি'ল-গায়ব এবং এমন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও ভরসা থাকবে যখন পদস্খলন ঘটার উপক্রম হয় এবং নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিতে থাকে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চলে যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই সে সব ঘটনার উদ্ভব ঘটে যার আশংকা করা গিয়েছিল। শিশু পিপাসায় অস্থির যেমন, তেমনি অস্থির তাঁর মাও। কিন্তু এই মরু বিয়াবানে কোথায় পানি? এখানে তো সামান্য নালা কিংবা ডোবার অস্তিত্বও কোথাও নেই যেখানে ছিটেফোঁটা পানি মিলতে পারে। এমতাবস্থায় শিশুর মায়ায় মা অস্থির হয়ে ওঠেন, হয়ে পড়েন বেহাল। পানি বিহনে, দুধের অভাবে শিশু মারা পড়বে, এই আশংকায় তিনি শংকিত হন। অতঃপর তিনি পানির সন্ধানে পাগলের মত ছুটতে থাকেন। অস্থিরভাবে দৌড়াদৌড়ির এক পর্যায়ে তিনি সাফা পর্বতের মাথায় গিয়ে ওঠেন, আবার পরক্ষণেই গিয়ে ওঠেন মারওয়া পাহাড়ের মাথায়। দ্বিতীয় পাহাড়ের কাছে পৌঁছবার পর অমনি তাঁর সন্তানের খেয়াল হয় যে, না জানি তাঁর আদরের মণি, নয়নের পুত্তলি কেমন ও কোন অবস্থায় আছে। এজন্য তিনি না থেমেই পুনরায় সন্তানের কাছে ফিরে আসেন, নিশ্চিন্ত হন যে, সন্তান তাঁর ভালই আছে, বেঁচে আছে। এরপর তিনি আবার অস্থির হয়ে ওঠেন। পুনরায় তিনি পূর্বোক্ত পাহাড়ের দিকে ছোটেন এই আশায় সম্ভবত কোন লোকের সাক্ষাত পাবেন তিনি, দেখা মিলবে কোন লোকের অথবা কোথাও পানির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবে। একদিকে তাঁর ভেতর এই অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা যা এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি, অপরদিকে সেই তৃপ্তি ও মানসিক প্রশান্তি যা কেবল আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা থেকে জন্ম নেয়। একদিকে একজন নবীর সহধর্মিণী ও আরেকদিকে একজন নবীর মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি জাহেরী আসবাব ও চেষ্টা-তদবীরকে ঈমান ও আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ভাবেন না। তিনি অস্থির ও ব্যাকুল-চিত্ত বটেন, কিন্তু তাঁর ভেতর হতাশা কিংবা নিরাশার সামান্যতম চিহ্ন ছাড়াই আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কোনরূপ দৌড়ঝাপ ছাড়াই তিনি বসেও থাকেন না। এমন দৃশ্য আসমান বুঝি এর আগে আর কখনো দেখেনি। এবার আল্লাহ্‌র রহমতের জোশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং অলৌকিকভাবে সেখানে একটি ঝরনা প্রবল বেগে উৎসারিত হয়। এটি ছিল যমযমের সেই মুবারক ও অফুরন্ত ঝর্ণাধারা যা কখনো শুষ্ক হয় না কিংবা যার পানি কখনো কম হয় না। তামাম দুনিয়ার জন্য, সমস্ত মানবমণ্ডলীর জন্য যা যথেষ্ট। তামাম জগদ্বাসী অদ্যাবধি এর দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত হচ্ছে। আল্লাহ

তা'আলা এই অস্থির ও ব্যাকুল হরকতকে, যা একজন নিষ্ঠাবতী ঈমানদার মহিলা থেকে প্রকাশ পেয়েছিল, এক এখতিয়ারী হরকত বানিয়ে দিলেন এবং দুনিয়ার তাবৎ বড় মেধার অধিকারী, জ্ঞানী-গুণী, খ্যাতিমান দার্শনিক পণ্ডিতকে, বিরাট থেকে বিরাটতর সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা-বাদশাহকে এর পাবন্দ বানিয়ে দিলেন। অনন্তর যতক্ষণ না তাঁরা এই দুই পাহাড়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি (সাঈ) করবে তাদের হজ্জই পুরা হবে না। এই দুই পাহাড় মূলত প্রতিটি আশেক ও আল্লাহ্ প্রেমিকের মনযিল আর এই দৌড়াদৌড়ি এই দুনিয়ার বুকে একজন মু'মিনের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সর্বোত্তম উদাহরণ। কেননা একজন মু'মিন 'আক্ল ও আবেগ, অনুভূতি ও 'আকীদা উভয়ের সমষ্টি হয়ে থাকেন। তিনি 'আক্ল তথা বুদ্ধির সাহায্য পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং জীবন-যিন্দেগীর প্রয়োজন ও কল্যাণে এর দ্বারা ফায়দা উঠিয়ে থাকেন। কিন্তু কখনো তিনি তার দিলের আবেগের সামনেও শির ঝুঁকিয়ে থাকেন যার শেকড় বুদ্ধির চেয়েও অনেক বেশি গভীর ও মজবুত হয়ে থাকে। তিনি এমন এক দুনিয়ায় অবস্থান করেন যা কামনা-বাসনা, জৈবিক চাহিদা, সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জায় ভরপুর। কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সাঈ করনেওয়ালার ন্যায় তিনি কোন দিকে চোখ না তুলে, কোন জিনিসের ওপর চক্ষু নিবদ্ধ না করে এবং কোন জায়গায় না থেমেই দ্রুততার সাথে সেখান থেকে অতিক্রম করে যান। তার সবচে' বেশি চিন্তা হয় আপন মনযিল ও আপন ভবিষ্যতের। তিনি আপন যিন্দেগীকে কতিপয় হাতে গোনা চক্করের মতই মনে করেন, যা তিনি আপন প্রভু-প্রতিপালকের আনুগত্যে এবং স্বীয় পূর্বপুরুষদের অনুসরণে লাগিয়ে থাকেন। তার ঈমান আলোচনা-অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধক হয় না এবং তার দৌড়ঝাপ (সাঈ) তার তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার ভেতর কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করে না। এ এমন এক হরকত যার সমগ্র মূল, রূহ ও পয়গাম দু'টো শব্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা যায় আর তা হল মুহব্বত ও তাবেদারী বা আনুগত্য। এরপর এই শিশু কিছুটা বড় হয় এবং এমন এক বয়সে উপনীত হয় যখন পিতার আপন সন্তানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা মায়া-মমতার সৃষ্টি হয়। বালক তাঁর পিতার সঙ্গে বাইরে বের হন, তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করেন, চলাফেরা করেন, সাথে সঙ্গেই থাকেন। তাঁর পিতা যাঁর ভেতর মানবীয় সহানুভূতি, মমত্ববোধ ও ভালবাসা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল, আপন চোখের মণি, নয়নের পুত্তলি, কলিজার টুকরোর প্রতি প্রচণ্ড মায়া-মমতা ও আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। আর এটাই ছিল সবচে' বড় পরীক্ষা। কেননা তাঁর দিল্ তো কল্ব-এ সলীম- যা ইলাহী প্রেমের জন্য ছিল নির্দিষ্ট। এ দিল্ তো কোন সাধারণ মানুষের দিল্ ছিল না, ছিল খলীলু'র- রহমান (আল্লাহ্র বন্ধু)-এর দিল্। ভালবাসা সব কিছু সইতে পারে, কিন্তু সইতে পারে

না কেবল শরীকানা। সে প্রতিদ্বন্দ্বী বরদাশ্‌ত করতে পারে না। সাধারণ মানুষের প্রেম-ভালবাসার অবস্থাই যখন এই তখন আল্লাহ্‌র মুহব্বতের অবস্থা কি হবে! ঠিক এমন মুহূর্তে হযরত ইবরাহীম (আ) আপন প্রিয়তম পুত্রকে কুরবানী দেবার ইঙ্গিত পান (স্বপ্ন যোগে)। আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের স্বপ্ন ওয়াহী তুল্য হয়ে থাকে। আর এজন্যই যখন তিনি বার কয়েক এই ইঙ্গিত পেলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং তাঁকে এ কাজ করতে হবে। তিনি তাঁর পুত্রের পরীক্ষা নেন। কেননা এই কাজ তাঁর সহযোগিতা, সম্মতি, ধৈর্য ও সহ্য শক্তি ব্যতিরেকে আনজাম দেওয়া কঠিন। একথা জেনে হযরত ইসমাঈল (আ) অপরিমেয় সৌভাগ্য জ্ঞানে, আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে একান্ত সন্তুষ্টচিত্তে আত্মসমর্পণ করেন এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা মেনে নেন। আর কেনই বা তিনি তা মেনে নেবেন না যিনি নিজে নবী, নবীর পুত্র এবং নবীর দাদা। আল-কুরআনের ভাষায়ঃ

"ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১০২

এরপর সেই ঘটনা সংঘটিত হয় যার সামনে বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে। বাপ আপন প্রাণাধিক পুত্রকে, সৌভাগ্যবান সন্তানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যান। তিনি আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে আপন পুত্রকে কুরবানী করতে যাচ্ছেন এবং পুত্রও তাঁর প্রভু-প্রতিপালক ও পিতার আনুগত্যে তাঁর সাথে যাচ্ছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য, উভয়ের লক্ষ্য এক আর তা হল আপন মালিকের হুকুম পালন করা এবং কোনো রকম টু শব্দটি না করে বিনা আপত্তিতে তাঁর সামনে মাথা নুইয়ে দেয়া। পথিমধ্যে শয়তানের সঙ্গে দেখা হয় যার কাজই হল মানুষকে হামেশা সৌভাগ্য থেকে মাহরূম করার চেষ্টা করা। সে তাঁদের এই উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এর থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা চালায়, খুবই সমবেদনা ও সহানুভূতির সাথে সুন্দর পন্থায় আল্লাহ্‌র নাফরমানীকে তাঁদের সামনে পেশ করে, জীবনের প্রতি লোভ দেখায়। কিন্তু শয়তানের একটি চালও সফল হয় না। তাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশেষে সেই মুহূর্তও ঘনিয়ে এল যদ্দৃষ্টে ফেরেশতারাও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন, অস্থির হন জিন্ন ও মনুষ্যকুলও। ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে মাটিতে শুইয়ে দেন, অতঃপর গলায় ছুরি চালান এবং যবাহ্‌ইর জন্য সার্বিক প্রয়াস পান। এবার আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এজন্য যে, হযরত ইসমাঈলকে যবাই করা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল না,

উদ্দেশ্য ছিল সেই মুহব্বতকে যবাই করা যা আল্লাহ্‌র মুহব্বতে শরীক হয়ে যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। আর এই মুহব্বত গলায় ছুরি রাখার সাথে সাথেই যবাই হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইসমাঈলের জন্ম হয়েছিল তো বেঁচে থাকার জন্যই। তিনি ফলে ফুলে সুশোভিত হবেন, তাঁর বংশ-বিস্তার ঘটবে এবং সায়্যিদু'ল-আম্বিয়া ও খাতিমু'ল মুরসালিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বংশে জন্ম নেবেন। অতএব আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিলাষ পূরণ হবার পূর্বেই তিনি কি করে যবাই হতে পারেন? আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জানের বিনিময়ে জান্নাতের একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন যা তাঁর পরিবর্তে যবাই করা যায় এবং একে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমস্ত অনুসারী ও পরবর্তী তাঁর সকল বংশধরদের জন্য সুন্নতে পরিণত করেন। কুরবানীর দিনগুলোতে তারা এই "মহান কুরবানী"র নবায়ন করে থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে কুরবানী দিয়ে থাকেন।

"যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাঁকে বললাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" সূরা সাফফাত ঃ ১০৩-১০৯

হযরত ইবরাহীম (আ) এবং শয়তানের এই কাহিনীকেও আল্লাহ্ তা'আলা স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা দান করলেন এবং সে সমস্ত জায়গায় যেখানে শয়তান তাঁর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল, পাথর নিক্ষেপের হুকুম দিলেন এবং একে এমন এক আমলে পরিণত করলেন যা প্রত্যেক বছর হজ্জের সর্বোত্তম দিনগুলোতে পালিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল এই যাতে শয়তানের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তার নাফরমানী ও এর প্রতি বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে। এটি এমন এক আমল যার ভেতর একজন মু'মিনের বড় মজা, স্বাদ ও জীবনের এক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করা দরকার। তবে শর্ত এই যে, তার ঈমান যেন পাকাপোখ্ত হয়, উপলব্ধি সঠিক ও বিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি আনুগত্যের আবেগ ও প্রেরণা যেন তার দিলে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে। কাহিনীর এই করণীয় কাজটি দোহরাবার সময় তিনি যেন অনুভব করেন যে, তিনি পাপের শক্তি এক শয়তান ও তাঁর বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত, যদিও শয়তান এর থেকে কংকর নিক্ষেপ (রজম) ও অপমান-অপদস্থ ছাড়া আর কিছু পায় না।

•এই ঘটনার পর অনেক দিন গুজরে গেছে। সেদিনের বালক আজ পরিপূর্ণ

যুবক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুওত ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতও আজ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বেশ ভালভাবে চতুর্দিকে তা বিস্তার লাভ করেছে। এখন তাঁর জন্য এমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন যার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা যায় এবং যদ্দ্বারা ঈমান শক্তি ও খোরাক পায়। এই দুনিয়ায় রাজা-বাদশাহদের মহল তো বহুই আছে, আছে মূর্তিপূজার মণ্ডপ যেখানে প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও শয়তানের পূজা চলে। কিন্তু আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য তখন পর্যন্ত এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে ইখলাসের সাথে, নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত হয় এবং তাঁর ইবাদত কর নেওয়ালা ও যিয়ারতকারীদের জন্য সর্বপ্রকার পাপ-পংকিলতা ও ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-সাফ রাখা হয়। এখন যখন দীন তার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং মুসলিম উম্মাহ্র বুনিয়াদ স্থাপিত হল তখন ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল্লাহ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হল, নির্দেশ দেওয়া হল এমন ঘর তৈরির যা সমগ্র মানবতার আশ্রয় কেন্দ্র ও শান্তির নীড় হবে এবং যেখানে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা হবে। পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে এই মুবারক ও পবিত্র ঘর তৈরি করেন যা বাহ্যিক আকার-আয়তন ও গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে খুবই সাধারণ ও মামুলী হলেও তা স্বীয় আজমতের দিক দিয়ে খুবই দৃঢ় ও সমুন্নত। তাঁরা উভয়ে মিলে পাথর কাটেন এবং এর দ্বারা দেওয়াল তোলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আর আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা বাকারাঃ ১২৭-২৮;

এই ঘর ঈমান ও ইখলাসের সেই বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নজীর পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা একে একান্তভাবে কবুল করেন, অনুগৃহীত ও ধন্য করেন, একে চিরস্থায়িত্ব দানের ফয়সালা করেন, একে সৌন্দর্য ও প্রভাবমণ্ডিত ঐশ্বর্য দান করেন, মানুষের অন্তরগুলোকে এর দিকে ঝুঁকিয়ে দেন আর একে গোটা মানবজাতির কেবলাগাহ্ এবং তাদের

অন্তর-মানসের জন্য চুম্বকের মত আকর্ষণী বানিয়ে দেন। লোক সেখানে চোখের পলকে গিয়ে হাজির হয় এবং এর ওপর দিল্ ও জান উৎসর্গ করে। এই ঘর সর্বপ্রকার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জা থেকে মুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত এবং এটি এমন শহরে অবস্থিত যা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোলাহল এবং জীবনের হৈ চৈ পূর্ণ ধারা থেকে বহু দূরে। কিন্তু তারপরও এর ভেতর আকর্ষণ পাওয়া যায় যদ্দরুন মানুষ এর দিকে টেনে হিচড়ে পাগলের মত গিয়ে হাজির হয় এবং একে এক নজর দেখবার জন্য অস্থির থাকে। যখন এই ঘর নির্মিত হল তখন অদৃশ্য লোক থেকে এই আওয়াজ ভেসে এল, "আর মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেটে ও সব রকমের ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন—ওর ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা ওর থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে গৃহের।" সূরা হজ্জঃ ২৭-২৯ ;

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে এই দুনিয়া চীজ-আসবাবের গোলাম ছিল এবং লোকে এগুলোর ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্ভর করতে শুরু করেছিল বরং তারা মনে করতে শুরু করেছিল যে, এগুলো স্বয়ম্ভূ সত্তা হিসেবে কায়েম ও কার্যকরভাবে সক্রিয়। এর ফল দাঁড়াল এই যে, এই সব চীজ-আসবাব আরবাব (প্রভু-প্রতিপালক)-এর দর্জায় উন্নীত হল। আর চীজ আসবাবের এমত দর্জার পবিত্রতা ও নির্ভরতা সেই মূর্তিপূজার পাশাপশি, যেই মূর্তিপূজার ভেতর মানুষ আগে থেকেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল—এক নতুন মূর্তিপূজার জন্ম দিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যিন্দেগী মূলত ঐসব মূর্তিপুজকদের বিরুদ্ধে ছিল বিদ্রোহ। তা নির্ভেজাল তৌহীদ এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামিলা, বেষ্টনী ও প্রশস্ততার ওপর ঈমানের দাওয়াত ছিল এবং ছিল এ কথার ঘোষণা যে, একমাত্র তিনিই তামাম বস্তুকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। তিনিই আসবাব পয়দা করেন এবং তিনিই এ সবের মালিক। তিনি যখন চান আসবাবকে মুসাব্বাব থেকে পৃথক করেন এবং বস্তুসামগ্রী থেকে তার বৈশিষ্ট্যসমূহকে ছিনিয়ে নেন এবং তা থেকে এমন সব বস্তু জাহির করেন যা এর বিপরীত। তাকে যখন চান, যেই জিনিসের জন্য চান ব্যবহার করেন এবং যেই কাজের জন্য চান লাগিয়ে দেন। লোকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্য আগুনের কুণ্ড তৈরি করে এবং বলে যে, "তাকে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে তোমরা যদি কিছু করতে চাও।"

সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৮; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, আগুন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। জ্বালানো বা পোড়ানো তার স্থায়ী গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয় যা তার থেকে কখনো আলাদা হতে পারে না। এটি একটি অতিরিক্ত গুণ যা আল্লাহ তা'আলা তার ভেতর আমানত হিসেবে রেখেছেন। এর লাগাম তাঁরই হাতে। যখন চান তা ঢিলা দেন এবং যখন চান টান দেন এবং ওই আগুনকেই দেখতে না দেখতেই ফুলের বাগানে পরিণত করেন। এই ঈমান ও ইয়াকীনসহ তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পূর্ণ প্রশান্তি সহকারে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাই হল যা তিনি ভেবেছিলেন।

"আমি (আল্লাহ্) বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। ওরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি ওদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৯-৭০

মানুষের সাধারণ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা হল এই যে, পানির প্রাচুর্য, উর্বর জমি ও ভূখণ্ড, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচার ওপর জীবন টিকে আছে। অতএব তারা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের জন্য, বংশ ও গোত্রের জন্য সেই সব শহর ও দেশের সন্ধানে ফিরে যা স্বদেশ হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত এবং যেখানকার জমি অত্যন্ত উর্বর, সবুজ ও শস্য-শ্যামল, যেখানে পানির প্রাচুর্য রয়েছে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, নিয়ম ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং নিজেই আমল করে দেখালেন। তিনি তাঁর ছোট ও স্বল্প পরিবারের জন্য, যা ছিল স্ত্রী-পুত্রের সমষ্টি, এমন এক উপত্যকা বেছে নিলেন যা ছিল উষর-ধূসর মরু উপত্যকা, যেখানে না ছিল কৃষি-খামার আর না ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী ক্ষেত্র কিংবা সুযোগ-সুবিধা। গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ; বাণিজ্য কেন্দ্র, রাজপথ, সম্পদ ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলেন যেন তিনি তাদের জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দান করেন, মানুষের অন্তঃকরণকে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং জাহিরী আসবাব ও সাধারণ পথ-ঘাট ছাড়াই যেন সর্বপ্রকার ফলমূল তাদের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি দু'আ করেন ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। 'হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, ওরা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-মূল দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" সূরা ইবরাহীমঃ ৩৭

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং এমনভাবে কবুল করেন যে, জীবিকা ও নিরাপদ শান্তি দু'টোরই জামানত প্রদান করেন এবং তাদের শহরকে সর্বপ্রকার ফলমূল ও স্বীয় অনুগ্রহরাজির কেন্দ্রে পরিণত করেন।

"আমি কি ওদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিযিকস্বরূপ? কিন্তু ওদের অধিকাংশই এটা জানে না।" সূরা কাসাসঃ ৫৭

"অতএব ওরা ইবাদত করুক এই ঘরের রক্ষকের যিনি ওদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।" সূরা কুরায়শঃ ৩-৪

তিনি তাঁর ঘরের লোকদেরকে এমন এক জমিনে রেখে গেলেন যেখানে গলা ভেজাবার মত পানিও ছিল না। কিন্তু প্রস্তর-সংকুল ও বালুপূর্ণ মরুভূমিতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করলেন। বালু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পানি উথলে উঠতে লাগল এবং কোনরূপ বিরতি ছাড়াই আজ পর্যন্ত তেমনি তা প্রবহমান রয়েছে। লোকে প্রাণভরে এই পানি পান করে এবং পাত্র ভরে সাথে করে নিয়ে যায়।

তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এমন এক বিরান ও অনাবাদী জায়গায় রেখে যান যেখানে মানুষ তো দূরের কথা তার ছায়াও দেখা যেত না। কিন্তু দেখতে না দেখতে সেই জায়গা এমন জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তের লোকই সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম (আ) -এর জীবন-যিন্দেগী তাঁর সমাজের সীমাতিরিক্ত বস্তুবাদ ও আসবাব পূঁজার বিরুদ্ধে ছিল এক খোলা চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহ্র অসীম কুদরতের ওপর সার্বিক আস্থার প্রকাশ এবং এটাই আল্লাহ্ তা'আলার রহমান সুন্নত। তিনি আসবারকে হামেশা ঈমানের অনুগত বানিয়ে দেন এবং ঐসব আসবাব থেকে সেই সব চীজ-আসবাব জাহির করেন যা অনুধাবনে বস্তবাদী দৃষ্টি অক্ষম।

হজ্জ ইবরাহীম (আ)-এর আমল ও সিফতের স্মারক এবং তাঁর দাওয়াত ও তা'লীমের নবায়ন

হজ্জ এবং তাঁর সমস্ত আমল ও মানাসিক (কুরবানীর নিয়মাবলী), অধিকন্তু ওই সিলসিলার তামাম ঘটনাব যেগুলো ঐসব আমলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, দৃশ্যসমূহ থেকে মুখাপেক্ষাহীনতা, অহংবোধ ও আত্মপূজা থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাক যা একজন হাজী পরিধান করে থাকেন এবং ইহরাম, উকূফ (অবস্থান), ইফাদা, প্রস্তর নিক্ষেপ, সাঈ ও তওয়াফের সেই সমস্ত আমল যা তিনি সম্পাদন করে থাকেন, মূলত তা তওহীদ, আসবাব-এর অস্বীকৃতি

আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা স্থাপন, তাঁর রাস্তায় কুরবানী, তাঁর আনুগত্য, অনুসরণ ও সন্তুষ্টিকে নিজের জীবনে কার্যকর করা, স্থায়িত্ব দান ও সক্রিয় করে তোলার একটি চেষ্টা ও তদবীর মাত্র যা আচার-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ, মিথ্যা মানদণ্ড ও কৃত্রিম মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং শক্তিশালী ঈমান, সত্যিকার ভালবাসা, নজীরবিহীন কুরবানী বা আত্মত্যাগ, সর্বোন্নত মানের আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থলেশহীনতার সংস্কার ও নবায়ন। হজ্জ সেই সব মহত্তর লক্ষ্য, বিশুদ্ধ আবেগ ও প্রেরণা, রূহানী ও ঈমানী মূল্যবোধ, অধিকন্তু সেই সব মানবীয় ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের স্থায়িত্ব ও উন্নতির যামানত দেয় যা কৃত্রিম জাতীয়তা, বংশগোত্র ও ভূখণ্ডের সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ মাপকাঠির উর্ধ্বের। হজ্জ হল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পথ ও মতের ওপর চলা, তাঁর রূহকে নিজের ভেতর সৃষ্টি করা এবং সকল জায়গায় ও সকল যুগে তাঁর দা'ওয়াতের পতাকাকে সমুন্নত রাখার দাওয়াত।

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম-এর মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!" সূরা হজ্জঃ ৭৮

ইতিহাসের নতুন শিরোনাম, মানবতার সীমারেখা

হযরত ইবরাহীম, তাঁর দাওয়াত ও তাঁর চেষ্টা-সাধনা মানবতারূপ গ্রন্থের নতুন, আলোকোজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল শিরোনাম। এর থেকে একটি ইতিহাস অন্য ইতিহাস থেকে আলাদা হয়ে যায়। গোটা মানবতা দুই শিবিরে ও দু'টো বিবদমান যুদ্ধক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে যায় যা সর্বকালের সঙ্গে হামেশা স্থায়ী হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতও অব্যাহত থাকে। এর থেকে পুরনো যুগ বিদায় নেয় এবং নতুন যুগের সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অবিনশ্বর ইমামত ও চিরস্থায়ী দাওয়াত দ্বারা ধন্য ও গৌরবান্বিত করেন। তাঁর বংশধরদের জন্য নবুওত ও বিলায়াত এবং দুনিয়ার ধর্মীয় নেতৃত্ব চিরদিনের নিমিত্ত লিখে দেন এবং তাঁর খান্দান ও তাঁর অনুসারীদের জন্য চূড়ান্ত ফয়সালা করেন যে, সত্যের জন্য জিহাদ ও আত্মোৎসর্গ, বাতিল ও মিথ্যার সঙ্গে স্থায়ী সংঘাত ও সংঘর্ষ, দা'ওয়াত ইলাল্লাহ, মানবতার ডুবন্তপ্রায় কিশতীকে তীব্র স্রোত ও উন্মত্ত তরঙ্গ সত্ত্বেও কূলে ভেড়ানোর দায়িত্ব এবং প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের হাত

থেকে এই জীবন প্রদীপের হেফাজত সর্বদাই তাঁদেরই মস্তকে ন্যস্ত থাকবে যার ওপর মানবতার পুরো কাফেলার নাজাত নির্ভরশীল।

মানবতার আশ্রয়

হজ্জ ও হজ্জ মৌসুমের যাবতীয় ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি (মানাসিক) এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের সন্তানদের মক্কায় এই বাৎসরিক সম্মেলন ও সমাবেশ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর নাম উচ্চারণকারী রূহানী সন্তানদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সেই সব অর্থ, আকীদা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের নবায়নের জন্য যথেষ্ট এবং এর ভেতর কেবল এই মিল্লাতের নয় বরং সমগ্র মানবতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

"পবিত্র কা'বা গৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" সূরা মায়িদা ঃ ৯৭

হেদায়েত ও ইরশাদ এবং জিহাদ ও ইসলাহ্র চিরস্থায়ী কেন্দ্র

ইসলাম ও নবুওতে মুহাম্মদীর যুগে এই ঘর হেদায়েত ও ইরশাদ, রূহানিয়াত ও লিল্লাহিয়্যাত, মনের খোরাক, চিত্তের প্রশান্তি ও তৃপ্তির এক স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয় যেখানে হজ্জের নিয়মকানুন ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়, রূহ ও দিলের শক্তি ও খোরাক সরবরাহ করা হয় এবং এর ব্যবহৃত সেলের স্থলে নতুন ও শক্তিশালী সেল লাগানো হয়। সমগ্র উম্মাহ্ এখান থেকে ধর্মীয় পয়গাম লাভ করে। গোটা মুসলিম জগত প্রত্যেক বছর এখানে একত্র হয়ে আপন মুহব্বত, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের মূল্য আদায় করে। আল্লাহ্ তা'আলার এই মজবুত রশি ও সুদৃঢ় স্তম্ভের সঙ্গে নিজের গভীর সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। দুনিয়ার বড় বড় মনীষী ও জ্ঞানী-গুণী, রাজা-বাদশাহ্, আমীর-উমারা, ধনী-গরীব, রাজনীতিবিদ ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ প্রেম-ভালবাসা ও আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে এর তওয়াফ করে। কিন্তু উপলব্ধি ও দূরদর্শিতা, চেতনা ও অনুভূতিসহ সে এর বাস্তব প্রমাণ দেয় যে, সে মতভেদ ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক ও ঐক্যবদ্ধ, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একই রঙে রঞ্জিত, একই চেতনায় উজ্জীবিত ও একই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, বিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কাতারে কাতারবদ্ধ, দারিদ্র্য সত্ত্বেও ধনী এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও সবল শক্তিশালী। সে যদিও তামাম মুসলিম বিশ্বে বিক্ষিপ্ত এবং আপন সমস্যাভারে ভারাক্রান্ত, জীবনের দাবি

মেটাতে ও চাহিদা পূরণে ব্যস্ত, বিভিন্ন গোত্র ও নানা জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সে সম্পর্কিত, বিবিধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, তথাপি একটি বিশেষ বিন্দুতে পৌঁছে তারা সকলেই একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায়, এক হয়ে যায়। তার জীবন তওয়াফ ও সা'ঈ, ইবাদত ও কুরবানী, ঈমান ও আকীদা এবং তার সফরের মনযিল এখন মিনা ও আরাফাত এবং হজ্জের বিভিন্ন মকাম। সে সব সময় আপন মনযিলে মকসূদের দিকে ধাবমান। স্থায়ী পথ চলা ও ক্রম- অগ্রসরমানতা, নিত্য-নতুন সাক্ষাত ও পরিচিতি, নিত্য-নতুন মনযিল ও রাস্তা আর এই সফরের পর সফর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত, শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি এভাবেই চলতে চলতে একদিন সে তার মালিকের সান্নিধ্যে গিয়েই মিলিত হয়।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একজন মুসলমান (বিশেষ করে সে যখন দূরবর্তী দেশের অধিবাসী-বহু দূর পথ অতিক্রম করে এসেছে) হজ্জের নিয়ম-নীতিসমূহ (মানাসিক) পরিপূর্ণভাবে আদায় করার পর সেই জায়গাটি দেখার জন্য আকুল ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে জায়গাটি খাতিমু'ল-মুরসালীন (সা)-এর দারুল হিজরত, শেষ বিশ্রামস্থল এবং ইসলামের করুণা ও আশ্রয়স্থল, যেখান থেকে আলোক-রশ্মি এভাবে বিকীরিত ও বিচ্ছুরিত হয়েছিল যে, সারা পৃথিবীই এই আলোকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেখান থেকে হেদায়েত, ইলম ও রূহানিয়াত এবং ইসলামের কুওত ও শওকতের ঝর্ণাধারা এমনভাবে উৎসারিত হয় যে, সমগ্র দুনিয়াটাকেই তা পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে। অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারার আগ্রহ তার চিত্তকে অস্থির করে তোলে যেই মদীনা মুনাওয়ারাতে ইসলাম আশ্রয় পেয়েছিল, সেখানে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় প্রণীত হয়েছিল, যেখানকার পবিত্র মাটি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অশ্রু ও রক্ত দ্বারা স্নাত। তার ব্যাকুল চিত্ত চায় যে, সে সেখানে সালাত আদায় করবে—সেই মসজিদে যেখানকার এক রাক'আত অন্য যে কোন জায়গার এক হাজার রাক'আতের সমান (বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীস)। সেই সব জায়গায় থেমে থেমে অগ্রসর হবে যেখানে কখনো পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ, শহীদ ও সিদ্দীকগণ থামতেন। এখন থেকে সত্যবাদিতা ও ইখলাস, ইশ্ক ও মুহব্বত এবং ইসলামের রাস্তায় বীরত্ব, পৌরুষ ও শাহাদতের ন্যায় অমূল্য সম্পদ সে লাভ করবে যা এখানকার সবচে' বড় উপহার ও সবচে' মূল্যবান সওগাত এবং সেই নবীর ওপর দরূদ প্রেরণ করবে যার দাওয়াতের বদৌলতে সে অন্ধকার থেকে আলোয়, মানুষের গোলামী থেকে আল্লাহ্ তা'আলার গোলামী ও বন্দেগীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ত ময়দানে পৌঁছাবার সুযোগ মিলেছে এবং সে প্রথম বারের মত ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করেছে ও মানুষের মূল্য বুঝতে পেরেছে।

বিকৃতি ও অনাসৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এই বার্ষিক সমাবেশের গুরুত্ব

হজ্জ মুসলিম মিল্লাতের বার্ষিক সমাবেশ ও সম্মেলন। অন্য কথায় বার্ষিক প্যারেড যার মুসলিম মিল্লাতের সত্যবাদিতা, পবিত্রতা এবং তার আসল ও প্রকৃত বুনিয়াদের হেফাজতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসসা রয়েছে। এই দীনকে বিকৃতি, অস্পষ্টতা ও ভেজালের হাত থেকে নিরাপদ রাখা, এই উম্মাহকে তার প্রকৃত উৎস ও আপন মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা এবং সেই সব ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচনে (যার শিকার পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীসমূহ হয়েছে) এই সমাবেশ ও সম্মেলন থেকে যে সাহায্য পাওয়া যায় তা অন্য কিছু থেকে পাওয়া যায় না। এই মহাবার্ষিক সম্মেলন এবং এর নির্দিষ্ট আমল ও নিয়ম-কানুনসমূহের বদৌলতে এই মহান ও অবিনশ্বর উম্মাহ সেই ইবরাহীমী রুচি, খানা প্রকৃতি ও মেযাজের ধারক-বাহক (যাকে আমরা দরদপূর্ণ, মু'মিন ও আশিকসুলভ, নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিকতাপূর্ণ, সহজ-সরল ও গভীর প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি) এবং সে এই উত্তরাধিকারকে পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছবার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এদিক দিয়ে হজ্জ এমন একটি জীবন্ত, শক্তিশালী ও কম্পিত দিলের ন্যায় যা এই উম্মাহ্র শিরা-উপশিরায় আগাগোড়া তাজা রক্ত সরবরাহ ও বণ্টন করে চলেছে যদ্দরুন এই উম্মাহ্ সামগ্রিকভাবে একই সময় ও একই জায়গায় আপন কর্মের পর্যালোচনার সামর্থ্য রাখে এবং এর উলামায়ে কিরাম ও সংস্কারকবৃন্দের সুযোগ ঘটে একে চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের ধোঁকা ও প্রতারণা, মূর্খ ও জাহিলদের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং সর্বপ্রকার কৃত্রিম ও কল্পনাপ্রসূত কিসসা-কাহিনীর হাত থেকে পাক-পবিত্র রাখার এবং একে এর ইবরাহীমী মৌলিকত্ব, মুহাম্মদী শরীয়ত ও নির্ভেজাল দীনের মানদণ্ডে রেখে আগাগোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। এর মাধ্যমে এই উম্মাহ তার ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে খুব ভালভাবে হেফাজত করতে পারে এবং সেই আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবাদকে সাফল্যের সাথে মুকাবিলা করতে পারে যা ইবরাহীমী ঐক্য ও মুহাম্মদী রঙ, পথ ও মতের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং যা অতীতের বিভিন্ন সব মযহাব ও মযহাবী জাতিগোষ্ঠীকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই উম্মাহ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে ও পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং একে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করতে হয়। কখনো এর ভেতর জীবন ও এর স্পন্দনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, কখনো-বা স্থবিরতা ও অলসতার। কখনো কাঠিন্য ও সংঘাত-সংঘর্ষের, কখনো সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা সমস্যা তার সামনে এসে হাজির হয়। কখনো বস্তুগত ও রাজনৈতিক প্রেরণা তাকে পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করে। কখনো বস্তুবাদিতা ও ধন-সম্পদের প্রাধান্য দেখা দেয়, কখনো-বা টানা পড়েন ও অভাব-অনটনের। কখনো তার ওপর অত্যাচারী বাদশাহ ও শাসক কিংবা নির্দয়

নিষ্ঠুর রাজনীতিবিদ জেঁকে বসে, আবার কখনো-বা তাকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই এই প্রয়োজন সর্বদাই অবশিষ্ট থাকে যে, ঈমানের এই চাপাপড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নিয়মিত উস্কে দিতে হবে, ইশ্‌ক ও মুহব্বতের আবেগে হাওয়া দিতে হবে এবং মিল্লাতের প্রতিটি ইউনিট যেন বিশ্বস্ততা ও জীবনোৎসর্গের সবক পায়। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জকে একটি বসন্ত মৌসুম বানিয়েছেন যার ভেতর উম্মাহ্‌র এই সার্বক্ষণিক বসন্ত বৃক্ষে ফল ও ফুলের সমারোহ ঘটে প্রচুর এবং মুসলমানদের এই বিশ্বব্যাপী পরিবার নিজেদের পুরনো কাপড় পরিত্যাগ পূর্বক এক নতুন ও দর্শনীয় পোশাকে সজ্জিত করে।

আন্তর্জাতিক হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনার চিরস্থায়ী কেন্দ্র

আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, এই উম্মাহ্‌র নাযুক থেকে নাযুকতরো যুগেও এবং অন্ধকার থেকে অন্ধকারতম যমানাতেও তিনি হজ্জকে সেই সব বরকতময় ব্যক্তিদের উপস্থিতি থেকে কখনোই মাহরূম রাখবেন না যাঁদেরকে আমরা উলামায়ে হক, আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দা, দাওয়াত ও ইসলাহের ময়দানের মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদ, সূফী-দরবেশ ও ওলী-আরিফ জানি ও বলি এবং যাঁদের দরুন হজ্জের পরিবেশ রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত দ্বারা এত বেশি ভরপুর হয়ে যায় যে, কঠিন থেকে কঠিনতম হৃদয়ও মোমের মত গলে যায় এবং প্রস্তরবৎ অন্তরও পানি হয়ে যায়। বিদ্রোহী ও নাফরমানও তওবাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যায়। সেই সব চোখ যা কখনও কোন দিন ভয়ে কিংবা ভালবাসায় অশ্রুসিক্ত হয়নি, দু'ফোটা অশ্রু যে চক্ষু দিয়ে কোন দিন নির্গত হয়নি, এখানে পৌঁছে তা আপনা- আপনি সিক্ত হয়ে ওঠে। দিলের নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আরেকবার জ্বলে ওঠে। আল্লাহ্‌র করুণা ধারা অঝোরে বর্ষিত হতে থাকে এবং সকীনা গোটা পরিবেশকে আপন আঁচল তলে ঢেকে নেয়। সেদিন শয়তানের মুখ লুকোবারও জায়গা থাকে না কোথাও।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আরাফাতের দিন শয়তান যতবেশি অপদস্থ, লাঞ্ছিত, রাগে-ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে, এমন হতে অন্য কোন দিন তাকে দেখা যায় না। এমনটা হবার কারণ কেবল এই যে, সে স্বচক্ষেই দেখতে পায় যে, আল্লাহ্‌র রহমত অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলা বড় বড় গুনাহ্ ও ক্ষমা করে দিচ্ছেন (মালিক বর্ণিত মুরসাল হাদীস)। এ সময় সমগ্র পরিবেশ এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। মনে হয় যে, কোন কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহ বুঝি তাকে স্পর্শ করেছে। সেই সব মুসলমান যারা দূরদরাজ জায়গা থেকে

এখানে আগমন করে তারা নিজেদের বিরান ও শূন্য দিলগুলোকে পুনরায় আবাদ করে, ঈমান ও মুহব্বত, জোশ-জযবা ও মর্যাদাবোধ, জ্ঞান ও উপলব্ধির তারা পাথেয় সংগ্রহ করে যা তাদের নিজেদের বাড়ি-ঘরে ফিরে যাবার পরও কাজে লাগতে পারে এবং এর সাহায্যে তারা সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা, প্রেসার বা চাপ, লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির মুকাবিলা করতে পারে। তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের সে সব ভাইদেরকেও এই সম্পদে অথবা এই উপহার-উপঢৌকনে শরীক করে যারা শারীরিক দুর্বলতা কিংবা অসুখ-বিসুখ অথবা অন্য কোন ওযরবশত এখানে হাজির হতে পারেনি। এই পন্থায় ঈমানের বৈদ্যুতিক প্রবাহ উম্মাতে মুহাম্মদীর সমগ্র দেহেই ছড়িয়ে পড়ে। এর দ্বারা মূর্খ-জাহিলদের ভেতর ইল্‌ম-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, কমযোর ও দুর্বলচিত্তের লোকদের হিম্মত বৃদ্ধি পায়, হতাশ ও বিমর্ষ লোকদের ভেতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশা-ভরসা সৃষ্টি হয়, উম্মাতে মুহাম্মদীর নিজেদের পয়গাম পৌঁছবার ও দাওয়াতের অপরিহার্য যিম্মাদারী পালনের নতুন শক্তি লাভ হয় এবং তাদের নতুন সফরের সূচনা ঘটে।

ইসলামী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিদর্শন

হজ্জ সেই সব ভৌগোলিক, বংশীয়, ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী জাতীয়তার বিজয়–বহু মুসলিম রাষ্ট্র (বিভিন্ন কার্যকারণ ও চাপের দরুন) যার শিকার। হজ্জ ইসলামী জাতীয়তার প্রকাশ ও ঘোষণা। এখানে পৌঁছে দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম জাতিগোষ্ঠী নিজেদের সে সব জাতীয় ও দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে মুক্ত হয় যে সব পোশাকদৃষ্টে তাদের চেনা যেত (যেমন মালয়ী, বালুচী, পাঠান, আরবীয় প্রভৃতি) যার সঙ্গে বহু জাতিগোষ্ঠী আবেগমণ্ডিতভাবে জড়িত- ইসলামের এক জাতীয় পোশাক গ্রহণ করে, দীন ও ধর্মীয় আইন এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পরিভাষায় যাকে "ইহ্‌রাম" বলা হয়ে থাকে, সর্বপ্রকার বিনয় ও নম্রতা, অসহায় ও কান্নাভরাক্রান্ত অবস্থায় একই ভাষায় একই গীত ও একই ধ্বনি প্রদান করে থাকে।

"লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্না'ল-হামদা ওয়া'ন-নি'মাতালাকা ওয়া'ল-মূল্‌ক, লা শারীক লাকা।" "হে আল্লাহ্! আমি হাজির, আমি হাজির। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির! সমস্ত হাম্‌দ ও সর্বপ্রকার নে'মত একমাত্র তোমারই জন্য এবং রাজত্ব ও কর্তৃত্বও তোমার । তোমার কোন শরীক নেই।" তাদের ভেতর শাসক ও শাসিত, প্রভু-ভৃত্য, ধনী-গরীব ও ছোট-বড় কোন পার্থক্য নেই। তাদের পোশাক ও ধ্বনি–দু'টোর ভেতরই ইসলামী জাতীয়তা প্রোজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এই

অবস্থাই হজ্জের অন্যান্য আমল, ইবাদত, মানাসিক, শাআইর মাকামগুলোতেও দৃষ্ট হয়। সেখানে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী ও প্রত্যেকটি দেশের লোক পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় এবং যেখানে নিকট ও দূর এবং আরব ও অনারবের সকল প্রকার পার্থক্য মিটে যায়। সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সকলে একই সাথে সা'ঈ করে. একই সঙ্গে মিনা সফর করে, আরাফাতে গমন করে এবং জাবালে রহমতে এক সঙ্গে হাজির হয়ে সকলেই দু'আ করে এবং সকলে মিলে মুযদালিফায় একত্রে রাত্রি যাপন করে।

"তোমরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশ'আরু'ল-হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করবে। যদিও ইতঃপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" সূরা বাকারা ঃ ১৯৮

"অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা বাকারাঃ ১৯৯

হাজীগণ মিনাতেও এক সাথে অবস্থান করেন এবং পশু কুরবানী, মস্তক মুণ্ডন ও শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপের সমুদয় কাজ একই সঙ্গে আনজাম দেন।

যতদিন পর্যন্ত হজ্জ আছে (ইনশাল্লাহ্ কিয়ামততক বাকী থাকবে) ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তাবত জাতীয়তা ও অনৈসলামী দাওয়াত গিলে ফেলতে সক্ষম হবে না। মুসলমানরা সে সবের সহজ গ্রাসে পরিণত হবে না, হতে পারে না এবং নিজ নিজ দেশে (যে দেশের সঙ্গে তাদের স্বভাবজাত আবেগ ও জাতীয় স্বাজাত্যবোধের দিক দিয়ে প্রকৃতিগত ভালবাসা থেকে থাকে) এমন কোন নতুন কা'বা বানাতে সফল হবে না, হতে পারে না যা হজ্জের স্থান দখল করবে এবং তামাম মুসলমান তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এই কিবলা চিরদিন একই থাকবে যেদিকে পূর্ব-পশ্চিম, আরব অনারবের সকল অধিবাসী মুখ ফিরাবে। এই বায়তুল্লাহও হামেশা এক থাকবে যার হজ্জ করবার জন্য ভারতীয় ও আফগানী, ইউরোপীয় ও মার্কিনী মুসলমান সকলে বারবার যেতে থাকবে।

"এবং সেই সময়কে স্মরণ কর যখন আমি কা'বা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থলকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" সূরা বাকারা ঃ ১২৫

দুনিয়ার প্রত্যন্ত প্রতিটি কোণ থেকে, দূর-দরাজ এলাকা ও দূরতিক্রম্য ভূভাগ থেকে লোক টেনে হিঁচড়ে দলে দলে এখানে আসবে, সেদিনের জন্য

নে'মত কামনা করবে, এজন্য দিন গুণতে থাকবে এবং এই দরবারে হাজিরা দেওয়াকে তার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও বিরাট সৌভাগ্য জ্ঞান করবে।

হজ্জের ফরযিয়ত একটি নির্দিষ্ট কাল ও জায়গার সঙ্গে নির্দিষ্ট

এই গোটা ফরযিয়ত ও ইবাদতের সম্পর্ক মক্কা মুকাররামা এবং পার্শ্ববর্তী মিনা ও ও 'আরাফাতের সাথে। এসব মানাসিক সেখানেই আদায় করা হয়ে থাকে। যিলহজ্জ ভিন্ন বছরের অন্য কোন মাসে, ওই নির্দিষ্ট তারিখ ভিন্ন খোদ এ মাসেরই অন্য কোন তারিখ এবং মক্কা মুকাররামা, মিনা ও আরাফাত প্রান্তর ভিন্ন অন্য কোন জায়গায় এই ফরয আদায় হবে না। যে সব ঘটনা, যে সব ব্যক্তি, যে সব হিকমত, মুসলিহাত ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের সঙ্গে হজ্জের সম্পর্ক তার দাবিই হল যে, এই আজীমু'শ-শান ফরয ইবাদতটি এই মাস, ঐ তারিখ এবং ঐ সব জায়গায় আদায় হবে। এই ফরয ইবাদতটি আল্লাহ্‌র দুই প্রেমিক ও প্রিয় পয়গম্বর ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর তৌহিদী জযবা, ইশ্‌কে ইলাহী, আত্মবিস্মৃতি, আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের (কুরবানী) স্মারক এবং তাঁদের সেই সব 'আশিকসুলভ' আমল ও নকল যা তাঁদের থেকে ঐসব জায়গায় এবং উল্লিখিত সময়ে প্রকাশ পেয়েছিল এবং যে সবের ভেতর ইশ্‌ক ও মত্ততা, আত্মহনন ও আত্মবিস্মৃতি, রসম-রেওয়াজ, আচার-অভ্যাস, পরিচিত প্রথা ও আইন এবং মানুষের সর্বপ্রকার স্বনির্মিত মানদণ্ড থেকে অল্পক্ষণের জন্য আযাদী ও বেনিয়াযীর অবস্থা সৃষ্টির বিরাট যোগ্যতা রয়েছে। অতঃপর সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদেরকে (চাই কি যে যুগের ও যেই জায়গারই হোক না কেন) ইবরাহীমী সভ্যতা, ইসলামের কেন্দ্র ও খানায় কা'বার সঙ্গে চির দিন সম্পর্কিত ও জড়িত রাখার যেই উদ্দেশ্য তা পূরণও এ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

১. ইসলামের রোকন চতুষ্টয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে মৎপ্রণীত 'আরকানে আরবা'আ' পাঠ করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের কতিপয় ধর্মীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য

১ম বৈশিষ্ট্য ঃ একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস এবং একটি স্থায়ী দীন ও শরীয়ত

মুসলমানদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তাদের জাতীয় অস্তিত্বের বুনিয়াদ একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস এবং একটি স্থায়ী দীন ও চিরন্তন শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত যাকে সংক্ষেপে মযহাব বা ধর্ম বলে। যদিও এর দ্বারা এর সঠিক অর্থ ও মর্ম আদায় হয় না এবং শাব্দিক সাযুজ্যতার দরুন বহু রকমের ভুল বোঝাবুঝি ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে। এজন্যই এর জাতীয় নাম ও বিশ্বজয়ী উপাধি কোন বংশ কিংবা খান্দান, ধর্মীয় নেতা, মযহাব প্রতিষ্ঠাতা ও দেশের পরিবর্তে এমন একটি শব্দ থেকে উদ্ধৃত ও উদ্ভূত যা একটি নির্ধারিত আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি জাহির করে। দুনিয়ার সাধারণ ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীসমূহ নিজেদের ধর্মীয় নেতা, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, পয়গম্বর, দেশ কিংবা বংশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাদের নাম সেই সব ব্যক্তিত্ব কিংবা সেই সব বংশ ও দেশের নাম থেকে উদ্ভূত, যেমন ইয়াহূদীরা ইয়াহূদ (Judaist) ও বনী ইসরাঈল (Bani Israel) নামে কথিত হয়। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রদের ভেতর এক পুত্রের নাম ছিল ইয়াহূদাহ এবং ইসরাঈল ছিল স্বয়ং হযরত ইয়াকূব (আ) -এর নাম। ঈসায়ী বা খৃস্টানরা (Christians) হযরত ঈসা (আ)-এর নামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কুরআন শরীফে তাদেরকে নাসারা নামেও স্মরণ করা হয়েছে। নাসেরাহ (Nazareth) হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর জন্মভূমির নাম। মজূসী বা অগ্নি-উপাসকদের ধর্মের অনুসারীদের যাদেরকে ভারতবর্ষের বুকে সাধারণভাবে পার্সী নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে- সঠিক নাম Zoroastrians বা যরদশতী, যাদের সম্বন্ধ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা Zarathust -এর সঙ্গে। তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ মত (Budhism) তার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা প্রযোজ্য।

উম্মতে মুসলিমা বা মুসলিম উম্মাহ খেতাব লাভ

কিন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধ— যাদেরকে কুরআন শরীফে এবং সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থ, ইতিহাস ও সাহিত্যে 'মুসলিমূন' ও 'উম্মতে মুসলিমা' উপাধিতে স্মরণ করা

হয়েছে এবং এখনও পৃথিবীর প্রতিটি প্রত্যন্ত কোণে তারা 'মুসলিম' নামে চিহ্নিত ও পরিচিত—ইসলাম শব্দের সঙ্গে, যার অর্থ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের সামনে মস্তক অবনত করা, আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে সোপর্দ বা সমর্পণ করে দেওয়া যা একটি স্থায়ী ও চিরন্তন ফয়সালা, একটি সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি, জীবন-পদ্ধতি, জীবন পথ। তারা আপন পয়গম্বরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও জাতি হিসেবে নিজেদেরকে মুহাম্মদী বলে না। ভারতবর্ষে ইংরেজরা সর্বপ্রথম তাদেরকে Mohamedans এবং তাদের আইনকে Mohammedan Law নামে নামকরণ করে। কিন্তু যারা ইসলামের রূহ তথা প্রাণসত্তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তারা এতে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং নিজেদের জন্য সেই প্রাচীন উপাধি মুসলিম নামকেই অগ্রাধিকার দেন। ফলে যে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকে মোহামেডান কলেজ কিংবা মোহামেডান কনফারেন্স নামে নামাংকিত হয়ে গিয়েছিল সে সবের নাম 'মুসলিম' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।[১]

'আকীদা, দীন ও শরীয়ত মুসলমানদের নিকট মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার

এরই ভিত্তিতে 'আকীদা, দীন তথা ধর্ম ও শরীয়ত মুসলমানদের গোটা জীবন-ব্যবস্থায় এবং তাদের সমাজ ও সভ্যতায় মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই এসবের ব্যাপারে অস্বাভাবিক রকমের অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমস্যাবলীর ওপর গভীরভাবে চিন্তাকরা, অধিকন্তু তাদের আইন প্রণয়ন, সংবিধান ও আইন, এমন কি সামাজিক ও নৈতিক বিষয়গুলোতে এই মৌলিক সত্যকে সামনে রাখা দরকার। একথা মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের (Personal Law) মূল ও বুনিয়াদী অংশ কুরআন শরীফ থেকে গৃহীত এবং এর বিস্তৃত ও খুটিনাটি বিষয় এবং এসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাদীস ও ফিক্‌হ-এর ওপর ভিত্তিশীল।

মুসলিম 'পার্সোনাল ল' মুসলমানদের দীন ও শরীয়তেরই একটি অংশ এবং তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কোন সামাজিক অভিজ্ঞতা কিংবা সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও এর জ্ঞান কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি আইন প্রণেতা ও সংস্কার কর্মে

---

১. উদাহরণত স্যার সৈয়দ আহমদ খান মরহুম প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতু'ল-উলূম আলীগড়ের নাম প্রথমে ছিল Anglo Oriental Mohammedan College. এরপর 'ভার্সিটি হলে এর নাম রাখা হয় মুসলিম ইউনির্ভাসিটি। তেমনি আলীগড়ের বিখ্যাত শিক্ষা সম্মেলনের নাম ছিল প্রথমে Mohammedan Educational Conference. পরে একে মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে লেখা ও অভিহিত করা হতে থাকে।

নিয়োজিত লোকদের ধর্ম নয়। এজন্য কোন মুসলিম গভর্নমেন্টও এর ভেতর পরিবর্তন করতে পারে না।

আর তা এজন্যও ধর্মের অংশ এবং এর ওপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য যে, ইসলামে ধর্মের গণ্ডী কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীর ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়। তা পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং এজন্যও বটে যে, ধর্মকে যদি সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে দেওয়া যায় তাহলে ধর্ম প্রভাবশূন্য, সীমাবদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ে আর সমাজ-সংস্কৃতি হয়ে পড়ে লাগামহীন, উচ্ছৃঙ্খল এবং প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার হাতিয়ার।

শরীয়তের আইন পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার নেই কারো

ইসলামী আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার নেই কারো। এসবের ভেতর কিছু অংশ এমন খোলাখুলি, পষ্ট ও অকাট্যভাবে কুরআন মজীদে এসেছে কিংবা তা এমন ধারাবাহিকতা সহকারে প্রমাণিত এবং এমন ধারাক্রমসহ এর ওপর আমল চলছে অথবা বলা চলে, এর ওপর আলিম-উলামার এমন ইজমা' বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এর অস্বীকারকারীকে এখন নীতিগতভাবে ও আইনগত দিক দিয়ে ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত মনে করা হবে।

আর চাই কি এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কার্যকর প্রয়োগের ভেতর সময় বা কালকে যতই লেহাজ করা হোক– এর ভেতর পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংশোধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, আইন প্রণয়ন সংস্থা বা কমিটি কোনরূপ পরিবর্তনের এখতিয়ার রাখে না। আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এমনটি কেউ করল কিংবা করার ইচ্ছা করল তবে সেক্ষেত্রে তা হবে এক বিকৃত কর্ম এবং দীনের ভেতর হস্তক্ষেপের নামান্তর। অবশ্য যে সব বিষয় ইজতিহাদী প্রকৃতির এবং যেগুলোর ভেতর কালের পরিবর্তনে বরাবর সংশোধন ও স্থিতিস্থাপকতা তথা নমনীয়তা সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলো মুসলিম পণ্ডিতমণ্ডলী ও ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ, যাঁরা কুরআন-হাদীস থেকে ইজতিহাদপূর্বক মসলা বের করে এর সমাধানের যোগ্যতা রাখেন, নিজস্ব ইরাদা ও এখতিয়ারে এবং জরুরী আলোচনা-পর্যালোচনা ও দৃষ্টি ক্ষেপণের পর গভীর চিন্তা-ভাবনা, নতুন অবস্থা ও পরিবর্তন রেআয়েতপূর্বক একে সময় ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে পারেন। আর এ প্রক্রিয়া ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই অব্যাহত থেকেছে এবং মুসলমানদের শেষ বংশ-পরম্পরা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট ধারণা ও ব্যবস্থা

মুসলমানদের দ্বিতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল পাক-পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট ধারণা ও ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) ও পাক-পবিত্রতার (purification)-এর পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অর্থ হল, শরীরে কোন ময়লা-আবর্জনা থাকবে না, পরিধেয় কাপড় পরিষ্কার ও সাফ-সুতরো হবে। আর পাক-পবিত্রতার অর্থ হল, শরীর ও পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদে পেশাব-পায়খানা অথবা এ ধরনের ময়লা জিনিস, যেমন মদের ফোঁটা অথবা গোবর ও বিষ্ঠা প্রভৃতি যদি লাগে তাহলে শরীর যত পরিষ্কারই কেন না হোক এবং কাপড় যত পরিষ্কার ও সাদা ধবধবেই কেন না হোক- মুসলমান পবিত্র হবে না এবং এ রকম শরীর ও কাপড় নিয়ে নামায পড়তে পারবে না। ঠিক তেমনি সে যদি পেশাব ও পায়খানা সমাপনের পর ইস্তিঞ্জা না করে অথবা তার গোসলের প্রয়োজন হয় তবে সে নাপাক। এমতাবস্থায় সে নামায পড়তে পারবে না। একই হুকুম পাত্র, ঘর-বাড়ী, বিছানা ও যমীনের ক্ষেত্রেও। এটা আদৌ জরুরী নয় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে ও দাগ শূন্য হলে তা পাক-পবিত্রও হবে। ওপরে যে সব জিনিসের উল্লেখ করা হল তা লাগলে এবং ওসবের কোন একটি জিনিসও পাক-সাফ করা ব্যতিরেকে তা পবিত্র হবে না, ব্যবহারযোগ্য হবে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ খাদ্য ব্যবস্থা (আহার্য ও পানীয়) কুরআনী নির্দেশের অধীন

মুসলমানদের তৃতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাদের খানাপিনা অর্থাৎ আহার্য ও পানীয় এবং পশু-পাখীর গোশ্‌ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা যা চাইবে খাবে ও পান করবে। তাদের জন্য কুরআন মজীদে ও ইসলামী শরীয়তে হালাল-হারাম এবং নিষিদ্ধ (খবীছ) ও অনুমোদিত (তায়্যিব)-এর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমান এ সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না। পশু-পাখীর ক্ষেত্রেও তারা এই নির্দেশের অধীন যে, তারা শরঈ তরীকা মাফিক যবাই করা ব্যতিরেকে এবং যবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে সে সবের গোশ্‌ত ব্যবহার করতে পারে না। যদি কোন পশু শরঈ তরীকায় যবাইকৃত না হয় কিংবা শিকারের ক্ষেত্রে কোন পাখীকে হালাল (১) করার অবস্থা না ঘটে তবে সেক্ষেত্রে এর হুকুম হবে মৃত পশু-পাখীর ন্যায় (বিধায় তা হারাম হবে)। তেমনি কোন পশু কিংবা পাখী যবাই করার সময় যদি গায়রুল্লাহ্‌র নিয়ত হয় কিংবা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নামে যবাই করা হয়, চাই কি তা কোন দেব-দেবীর নামে হোক

কিংবা মূর্তির নামে হোক অথবা কোন পীর-পয়গম্বর ও শহীদের নামেই হোক, তবে সে ক্ষেত্রে মৃতের হুকুম আরোপিত হবে (অর্থাৎ তা খাওয়া হারাম হবে) এবং তা খাওয়া জায়েয হবে না। পশুর ভেতর শূকর ও কুকুর চিরদিনের তরে হারাম ও নাপাক। আর কিছু কিছু পশু খাওয়া নিষিদ্ধ এবং তার গোশ্ত হারাম, অথচ সেসব পশু আপন সত্তার দিক দিয়ে অপবিত্র নয়। যেমন হিংস্র প্রাণী, সিংহ, নেকড়ে, চিতাবাঘ প্রভৃতি। তেমনি কিছু পাখী আছে সেগুলো হালাল, আবার কিছু আছে হারাম, যেমন শিকারী পাখী ও পাঞ্জা দিয়ে ধরে ছিড়ে খায় এমন সব পাখী। এর ভেতর আছে চিল, শকুন, বাজ পাখী প্রভৃতি যেগুলো হারাম। এর বাইরে যে সব পাখী শিকার করে না, মুখের সাহায্যে খায় তা হালাল। এটি মূলত ইবরাহীমী হিসেবে অভিহিত করত মুসলমানদেরকে, তা তারা দুনিয়ার যে কোন দেশে এবং ইতিহাসের যে কোন যুগেই হোক না কেন, এর অনুগত বানানো হয়েছে। মদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম যা প্রথম থেকেই ইসলামী শরীয়তে হারাম এবং একে উম্মু'ল-খাবাইছ বলা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য কোন অবস্থাতেই তা পান করা জায়েয নয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ঃ হুযূর (সা)-এর সঙ্গে (আতিশয্য মুক্ত) আন্তরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র

মুসলমানদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, তাদের আপন পয়গম্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক নবীর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের) অবস্থানগত মর্যাদা কেবল একজন বিরাট মানুষ, সম্মান ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় নেতারই নয়, তাদের সম্পর্ক মহানবী (সা)-এর পবিত্র সত্তার সঙ্গে এর চেয়ে কিছু বেশী এবং এর থেকে কিছুটা ভিন্ন। তাঁর আজমত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে চাইলে এর চেয়ে সর্বোত্তম পন্থায় আর বিবৃত হতে পারে না ঃ 'বাদ আয খোদা বুযুর্গতুয়ী কিচ্ছা মুখতাসার' আল্লাহ্‌র পরে তোমারই অবস্থান, ব্যস! সংক্ষেপে কথা এতটুকুই।" মুসলমানদেরকে হুযূর (সা) সম্পর্কে সমস্ত রকমের শেরেকী ধ্যান-ধারণা এবং সেসব মাত্রাতিরিক্ত অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জিত কথন থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা কোন কোন নবীর উম্মতেরা তাদের নবী-রসূল সম্পর্কে ব্যক্ত ও পোষণ করে। একটি সহীহ্ হাদীসে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, আমাকে সীমার ওপর উঠাবে না এবং আমার সম্পর্কে সে রকম বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তির আশ্রয় নেবে না যেমনটি খৃস্টানেরা তাদের নবী সম্পর্কে করে থাকে। বলতে চাইলে এতটুকু বলবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল।

নবীর প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসা

কিন্তু এই ভারসাম্যপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে সাথে মুসলমানরা আপন নবীর প্রতি তুলনাহীন ভালবাসা পোষণ করে থাকে। মুসলমানরা আপন নবীর সঙ্গে যেই আবেগ বিজড়িত আকর্ষণ ও আন্তরিক সম্বন্ধ রাখে তা আমাদের সীমিত জ্ঞান ও অধ্যয়নে পৃথিবীর অপর কোন জাতি কিংবা গোষ্ঠী তাদের নবীর সঙ্গে রাখে না। একথা বলা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, মুসলমানদের ভেতর এমন হাজারো ও লাখো মানুষ পাওয়া যাবে, হুযূর আকরাম (সা)-কে যারা তাদের আপন পিতা-মাতা, সন্তান–সন্ততি, এমনকি আপন প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে ও প্রিয় জ্ঞান করে এবং তাঁর পবিত্রতা ও সম্মান-সম্ভ্রম হেফাজতকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাবে। তারা কোন সময়ও তাঁর মুবারক সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর এতটুকু ছায়াপাতকে পর্যন্ত বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এ ব্যাপারে তারা এতটা আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ যে, এ ধরনের নাপাক ও না মুবারক মুহূর্তে তারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও ইতস্তত করে না। প্রতিটি যুগেই এর সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য মিলবে। আজও তাঁর নাম, তাঁর মান-সম্মান, তাঁর শহর, তাঁর বাণী, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ও সম্বন্ধযুক্ত জিনিসপত্র মুসলমানদের নিকট প্রিয়তম এবং তা তাদের রক্তে ও তাদের শিরা-উপশিরায় উত্তাপ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি, যমীনদার পত্রিকার সম্পাদক মওলানা জাফর আলী খান, বিএ (আলীগড়) -এর নিম্নোক্ত দু'টো পংক্তিতে ঃ

"নামায ভাল, যাকাত ভাল, হজ্জ ভাল, রোযাও ভাল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি মুসলমান হতে পারি না, যতক্ষণ না শাহানশাহে ইয়াছরিব (মুহাম্মদ) -এর সম্মান রক্ষায় আমার জীবন বিলিয়ে দিই, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।"

যেই অধিক হারে হুযূর আকরাম (সা)-এর ওপর দরূদ পাঠানো হয় এবং মুসলমানের নিকট এর যে গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে, যেরূপ অধিক সংখ্যায় সীরাত মুবারকের ওপর দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা লেখা হয়েছে এবং এখনও লিখিত হচ্ছে, আত্মার যেই দহন জ্বালা, হৃদয়ের যেই ভালবাসা, প্রেমিকসুলভ আবেগ, কাব্যের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা, ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতা এবং বর্ণনা ও বাকচাতুর্যের যেই স্বাদ ও অপরূপ মিষ্টতা তাঁর প্রশংসায় রচিত কাব্য-সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে ও পাচ্ছে তার নজীর দুনিয়ার সাহিত্য -ভাণ্ডারে দুর্লভ। কবির ভাষায়, "ভোরের বায়ুরে! তুমি গিয়ে আমার সালাম পেশ কর, তারপর বল যে, আল্লাহ্‌র নামের পর আমি তোমার নামই দিনরাত জপছি।"

খতমে নবূওতের আকীদা

মুসলমানদের এও আকীদা ও বিশ্বাস যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র আখেরী নবী এবং তাঁর উপর ওয়াহী ও নবূওতের ধারা চিরতরে খতম হয়ে গেছে। এখন তাঁর পরে যেই নবূওতের দাবি করবে নিশ্চিতই সে মিথ্যুক ও প্রতারক। এই আকীদা-বিশ্বাসের বুনিয়াদ কুরআন, হাদীস ও ধারাবাহিক বর্ণনা সূত্র। এই আকীদা-বিশ্বাস মুসলিম সমাজের জন্য চিরদিন এক লৌহ-প্রাকার ও সীমান্ত রেখার ভূমিকা পালন করেছে এবং এই আকীদা প্রতিটি যুগে মুসলমানদেরকে চালাক ও চতুর লোকদের চক্রান্তের শিকার হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বায়ত-এর সঙ্গে ভালবাসা

সেই সব মুসলমান যাঁরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ পেয়েছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, সাধারণভাবে তাঁরা সাহাবা নামে কথিত। মুসলমানগণ তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করেন এবং তাঁদের খেদমতের স্বীকৃতি দান করাকে জরুরী বিবেচনা করেন, তাঁদেরকে আদর্শ ও অনুপম মুসলমান, নিজেদের উপকারী বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জ্ঞান করেন এবং কখনো তাঁদের নাম নিতে হলে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" বলেন অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের ওপর প্রসন্ন হউন। এদেঁর ভেতর চারজন জলীলু'ল-কদর সাহাবা পর্যায়ক্রমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা হন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উছমান (রা) ও হযরত আলী (রা)। সাহাবাদের মধ্যে এঁদেরকে সর্বাধিক মর্যাদাবান মনে করা হয় এবং জুমু'আ ও দুই ঈদের খুতবায় মহানবী (সা)-এর পর তাঁদের নাম নেওয়া হয়। এঁদের ছাড়াও আরও ছ'জন সাহাবা আছেন যাঁদেরকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তাঁদের জীবদ্দশায় বেহেশ্‌তী হবার সুসংবাদ দান করেছিলেন। এই দশজন সাহাবীকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

মুসলমানগণ মহানবী (সা)-এর পরিবারের লোকদেরকে, যাঁদের আহলে বায়ত বলা হয়, যাঁদের ভেতর তদীয় বিবি সাহেবান, কন্যা চতুষ্টয় ও দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন শামিল, ভালবাসাকেও ফরয মনে করে এবং তাঁদেরকে সব সময় প্রীতি ও ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং একে তাদের পয়গম্বরের প্রতি ভালবাসার দাবি ও অত্যাবশ্যকীয় মনে করে।

কুরআন মজীদের আজমত ও তাঁর মর্যাদা

একই ব্যাপার তাদের কুরআন মজীদের ক্ষেত্রেও যে, একে মুসলমানরা কেবল জ্ঞানবত্তা, নৈতিক উপদেশমালা ও সামাজিক আইনের কোন সংকলন মনে করে না যা একটা পর্যায়ে সম্মানযোগ্য এবং সময় সুযোগে সম্ভবমত যতটা পারা যায় এর ওপর আমল করলেই হবে বরং একে তারা প্রথম থেকে শেষ অবধি শাব্দিক ও অর্থগতভাবে আল্লাহ্র কালাম ও আল্লাহ্র ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ মনে করে যার এক একটি হরফ এবং এক একটি নুকতা সংরক্ষিত এবং এর ভেতর কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। তারা একে সর্বদা ওযূ অবস্থায় পাঠ করে ও একে ওপরে উঁচু জায়গায় রাখে।

মুসলমানদের ভেতর কুরআন মজীদ হিফ্জ-এর রেওয়াজ

কুরআন মজীদ হিফজ-এর রেওয়াজ তামাম দুনিয়াতে প্রচলিত। এজন্য স্থায়ী মাদরাসা আছে যেখানে শাস্ত্রীয়ভাবে তাজবীদ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং হিফ্জ করানো হয়। কেবল এই উপমহাদেশেই কুরআনে হাফিজদের সংখ্যা হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। এঁদের ভেতর এমন হাফিজও আছেন যারা এক রাতে সমগ্র কুরআন শরীফ শোনাতে পারেন ও শুনিয়ে থাকেন এবং এমন বুযুর্গ হাস্তিও আছেন যাঁরা বছরের পর বছর প্রতি রমযানে প্রতি দিন এক খতম কুরআন মজীদ মুখস্থ তেলাওয়াত করে থাকেন এবং এটা তাঁদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এসব হাফিজদের ভেতর দশ-বার বছরের বালকের সংখ্যাও অনেক যাঁদের এই ভলিউম[১] কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্ত এবং তারা পানির মত অনায়াসে পড়তে পারে। মহিলাদের ভেতরও এক বিরাট সংখ্যক হাফিজ সবযুগেই পাওয়া গেছে এবং আজও তা পাওয়া যায়।[২]

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ঃ বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক

মুসলিমদের পঞ্চম জাতীয় বৈশিষ্ট্য যা অনুধাবন করা ও একে সম্মান দেওয়া বাস্তববাদিতার পরিচায়ক ও এর স্বাভাবিক দাবি আর তা হল এই যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে বিশ্ব-বিজয়ী মিল্লাত এবং নিজেদের দীন তথা ধর্মকে আসমানী ও বিশ্ব-ধর্ম মনে করে। তারা সেই দেশের সঙ্গে যেখানকার তারা বাসিন্দা, প্রেম ও প্রীতির, বিশ্বস্ততা ও কল্যাণ কামনার পরিপূর্ণ মন-মানসিকতা এবং নির্মাণ ও উন্নতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সাথে সাথে নিজেদেরকে সেই আন্তর্জাতিক পরিবারের একজন সদস্য কিংবা সেই আন্তর্জাতিক মিল্লাতের একটি ক্ষুদ্র পরিবার মনে করে এবং তারা মুসলিম বিশ্বের সমস্যা-সংকটের ব্যাপারে উ

ৎসাহভরে অংশ নেয়। পৃথিবীর অপরাপর মুসলিম দেশের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা-সংকট দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় এবং সম্ভাব্য ও আইনগত সীমারেখার ভেতর তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাদের নৈতিক সাহায্য করাকে দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের পরিপন্থী জ্ঞান করে না বরং ধর্ম, মানবতা, স্বভাব-প্রকৃতি ও ইনসাফের দাবি বলে মনে করে এবং একে নিজেদের দেশের জন্য উপকারী ও সংহতির কারণ বলে বিশ্বাস করে। এটা তাদের জাতীয় মেযাজ এবং তাদের শিক্ষা ও ইতিহাসের স্বাভাবিক দাবি। তাদের সম্পর্কে কোন মতামত কায়েম কিংবা কোন কর্মপন্থা নির্ধারণের পূর্বে তাদের এই মেযাজগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা খুবই জরুরী।

মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব

মুসলমানদের দু'টো পর্ব খুব বড়, আর এ দু'টো পর্ব হল ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল আযহা। যথাক্রমে এ দু'টো পর্ব ঈদ ও বকরাঈদ নামেও সর্বত্র পরিচিত। রমাযানুল মুবারকের সমাপ্তিতে এবং শাওয়াল (ইসলামী বর্ষপঞ্জীর দশম মাস)-এর চাঁদ দেখা দেবার পর শাওয়ালের প্রথম তারিখেই ঈদ অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু রমাযান মাস সিয়াম পালনের মাস আর এ মাস ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ইবাদত-বন্দেগী, আত্মসংযম এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হয় সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ঈদের চাঁদের জন্য সকলেই বড় অধীর অপেক্ষায় থাকে। বিশেষ করে ঊনত্রিশ তারিখের চাঁদ এ খুশীর মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। উর্দু ভাষায় ঈদের চাঁদ ও ঊনত্রিশের চাঁদ প্রবল আগ্রহ ও আনন্দানুভূতি প্রকাশক হিসেবে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। রমাযানের ঊনত্রিশ তারিখে বেলা ডোবার মুহূর্তে মুসলমানদের চক্ষুসমূহ পশ্চিমাকাশের প্রতি থাকে নিবদ্ধ এবং সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর মানুষ এ সময় চাঁদের খোঁজে থাকে মশগুল। এ দিন চাঁদ দেখা না গেলে পরদিনও সিয়াম পালিত হয়। ফলে সিয়াম ত্রিশে পূর্ণতা পায়। এদিন আর চাঁদ দেখার ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় কিংবা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চাঁদের ওপর নজর পড়তেই চতুর্দিক থেকে সমস্বরে মুবারক, সালামত প্রভৃতি ধ্বনি উত্থিত হতে থাকে। এ সময় ছোটরা বড়দেরকে সালাম জানায়। শিশুরা পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী ও মহিলাদেরকে ঈদ মুবারক জানায় এবং তাদের দো'আ নেয়। যারা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ এবং সুন্নতের ওপর আমল করতে চেষ্টা করে তারা সাধারণত নীচের দু'আটি পাঠ করে থাকে ঃ রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ হেলালু রুশদিন ওয়া খায়রিন; আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলায়না বি'ল-আমনি ওয়া'ল-ঈমান ওয়াস-সালামাতি ওয়া'ল-ইসলাম ওয়া'ত্-তাওফিকী লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা, "(ওহে চাঁদ!)

আমার ও তোমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্। চাঁদ, তুমি হেদায়েত ও কল্যাণের। হে আল্লাহ! এই মাসকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্ত ও আনুগত্যের সঙ্গে এবং আপন মর্জি ও ভালবাসার তৌফীকের সাথে শুরু করাও।"

ঈদের অভ্যর্থনা এবং এ দিনের আমলসমূহ

কয়েকদিন আগে থেকেই ঈদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ঈদের রাতে বিরাট হৈ-চৈ এবং বাজারে ও ঘরে আনন্দের খৈ ফোটে। সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় ঈদের প্রস্তুতি এই সত্য প্রকাশের নিমিত্ত যে, আজ আর সিয়াম নেই, নেই রোযা। আজ আল্লাহ্ পাক আমাদের বিগত ২৯ বা ৩০ দিনের বিপরীতে খানাপিনার এজাযত দিয়েছেন। খুব সকালেই যে যার সামর্থ্য মাফিক খোরমা, খেজুর কিংবা সেমাই জর্দা ফিরনি সহযোগে নাশতা সারেন। এরপর শুরু হয় সকাল সকাল গোসলের ধুম। আল্লাহ্ পাক যার যেরকম সামর্থ্য দিয়েছেন সেই মুতাবিক নতুন পোশাক পরিধান আবশ্যকীয় জ্ঞান করেন। গোসল সেরে, কাপড় পরে, শরীরে আতর লাগিয়ে, খোশবু মেখে অতঃপর সকলে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হন। ঈদগায় যাবার আগে গরীব দুঃস্থদের জন্য কিছু খাদ্য-শস্য (গম, চাউল ইত্যাদি) কিংবা নগদ টাকা-পয়সা রেখে যান যাকে সাদকায়ে ফিত্‌র (সংক্ষেপে ফিতরা) বলে। এ যেন রমযানের সিয়ামের শুকরিয়া। ফিতরা হিসেবে গম দিলে এর পরিমাণ হবে পৌণে দুই কেজির কাছাকাছি আর যব হলে এর পরিমাণ হবে এর দ্বিগুণ। গম ও যবের পরিবর্তে এর মূল্যও প্রদান করা যায় যা খাদ্য-শস্যের মূল্যের উঠানামার সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সাদকায়ে ফিত্‌র প্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া শিশুদের পক্ষ থেকেও আদায় করা হয়। ঈদের সালাত সূর্য উঠার বেশ খানিক পর আদায় করা সুন্নত এবং এক্ষেত্রে যতটা তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভাল। সাধারণত বড় জামা'আত শহরের ঈদগাহগুলোতেই হয়ে থাকে। অধুনা শহরে খোলা ময়দানের অভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মসজিদগুলোতে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঈদের সালাত

মুসলমানরা যখন ঈদের সালাত আদায় করতে যান তখন পথে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও শোকর জ্ঞাপক শব্দ আস্তে আস্তে পাঠ করতে করতে যান, তাকবীর পাঠ করতে করতে পথ চলেন। সুন্নত তরীকা হল এই যে, এক পথ দিয়ে ঈদগায় যেতে হবে এবং অন্য পথে ঈদগাহ্ থেকে ফিরতে হবে যাতে করে উভয় পথেই আল্লাহ্‌র আজমত এবং মুসলমানদের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও আল্লাহ্‌র একত্বের

শান প্রকাশ পায় (অবশ্য এর আরেকটি উপকার হল এই যে, এতে লোকের প্রচণ্ড ভিড় ও ঠেলাঠেলি এড়ানো যায়)।

পাঞ্জেগানা সালাত ও জুমু'আর বিপরীতে দুই ঈদে সালাতের আগে যেমন আযান নেই, তেমনি নেই ইকামত। তেমনি এই সালাতের আগে-পিছে সুন্নত কিংবা নফলও নেই। মুসলমানগণ এতে হাজির হতেই সালাত শুরু হয়ে যায়। ইমাম অগ্রসর হন এবং সালাত শুরু হয়। সাধারণ সালাতে দুই তকবীর। এক, তকবীরে তাহরীমা যদ্দ্বারা সালাত শুরু হয় এবং আরেকটি রুকুর তকবীর। কিন্তু দুই ঈদে তকবীরে তাহরীমা ছাড়াও প্রতি রাক'আতে অতিরিক্ত তিন তকবীর বলা হয়। অতঃপর সালাত সমাপ্তির সালাম ফেরানোর পরপরই ইমাম সাহেব মিম্বরে গিয়ে দাঁড়ান এবং ঈদের খুতবা দেন যা জুমু'আর খুতবার ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম খুতবা দেবার পর তিনি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বসেন এবং অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দেন। জুমু'আয় প্রথমে খুতবা, অতঃপর সালাত, পক্ষান্তরে ঈদে প্রথমে সালাত, অতঃপর খুতবা। খুতবায় ঈদের হাকীকত তথা এর তাৎপর্য, এর বাণী ও পয়গাম, হুকুম-আহকাম ও মসলা-মাসায়েল এবং সময়ের চাহিদা ও দাবির ওপর আলোকপাত করা হয়ে থাকে।

ঈদুল-আযহায় কুরবানীর ইহতিমাম ও এর মাহাত্ম্য

ঈদুল-আয্‌হা বা বকরাঈদে কেবল কুরবানীর অংশটুকু অতিরিক্ত। এই ঈদে সাদকাতু'ল-ফিত্‌র নেই। এ ছাড়া আরেকটি পার্থক্য আছে আর তা হল ঈদু'ল-ফিতর শাওয়াল মাসের ১লা তারিখে আর ঈদু'ল-আযহা যিল-হজ্জ (চান্দ্র মাসের দ্বাদশতম) মাসের দশ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সেই দিন যখন মক্কা মু'আজ্জমায় হাজী সাহেবান হজ্জের পালনীয় রোকনসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং মক্কা থেকে চার মাইল দূরবর্তী মিনা নামক উপত্যকায় আল্লাহর যিক্‌র, ইবাদত-বন্দেগী, কুরবানী এবং আল্লাহ্‌র নি'মতরাজির ব্যবহার ও খানাপিনার ভেতর মশগুল হয়ে থাকে। আরেকটি পার্থক্য হল, ঈদুল-ফিতর কেবল একদিন আর ঈদুল-আযহা তিন দিন (১০, ১১ ও ১২ তারিখ) হয়ে থাকে। তবে ঈদুল আযহার সালাত ১০ই তারিখে আদায় করা হলেও কুরবানী ১২ই তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেওয়া যায়। ঈদুল-আযহাতে আরেকটি বর্ধিত আমল হল, ৯ই যিল-হজ্জের ফজর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের 'আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর কিছু নির্দিষ্ট বাক্য সজোরে পাঠ করতে হয় যার ভেতর আল্লাহ্‌র আজমত তথা মাহাত্ম্য ঘোষণা ও তাঁরই প্রশংসাগীতি রয়েছে যাকে তাকবীর-এ তাশরীক বলা হয়। এখানে তরজমাসহ তকবীর-এ তাশরীক উল্লেখ করা হল ঃ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহি'ল-হ'াম্‌দ।

অর্থাৎ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আর আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা।"

অতঃপর কুরবানীর গোশ্‌ত তিন ভাগ করা হয়। এক ভাগ পরিবারস্থ লোকদের ও দাওয়াতী মেহমানদের, এক ভাগ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন এবং এক ভাগ গরীব-মিসকীনের জন্য নির্ধারিত। দিনটি খানাপিনার জন্য নির্ধারিত। তাই ঈদু'ল -ফিতর ও ঈদুল আযহাতে চার দিন সিয়াম (রোযা) পালন নাজায়েয। সাধারণত ঈদু'ল-আযহার দিন মুসলমানগণ পেট পুরে পরম তৃপ্তির সাথে খেয়ে থাকে আর এই উপলক্ষে এমন বহু খাবার খাওয়ার সুযোগ পায় ও পেট পুরে গোশ্‌ত খেতে পায় যা অধিকাংশ সময় এমনকি অনেকের পক্ষে সারা বছরেও জোটে না।

দু'টো পর্বই মুসলমানদের আন্তর্জাতিক পর্ব

ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহা মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক পর্ব যার ভেতর কোন দেশ, জাতি-গোষ্ঠী ও শ্রেণী-সম্প্রদায়ের পার্থক্য করা হয়নি এবং এ দুই পর্বের শরঈ ও দীনী অবস্থানগত মর্যাদার ব্যাপারে কারও কোন প্রকার দ্বিমত বা মতভেদ নেই এবং কোন যুগেই এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। দুনিয়ার সকল দেশে ও সকল রাষ্ট্রেই– চাই কি সে সব দেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ– এই দুই পর্ব উদযাপনের পন্থা-পদ্ধতি ও আমলের ভেতর কোন পার্থক্য নেই। আর কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের ভেতর অব্যাহত ধারায় চলে আসা সকল ধর্মীয় আমল ও অনুষ্ঠানেরই এ এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমানদের সমাজ ও সামাজিকতা

জন্ম থেকে সাবালকত্ব লাভ পর্যন্ত

ইসলামী শরীয়ত একজন মুসলমানের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যবস্থা রেখেছে এবং এমন পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়াস চালিয়েছে যার ভেতর সে যেন এই সত্য বিস্মৃত হতে না পারে, সে যেন প্রতিটি মুহূর্তে এবং জীবনের সকল মনযিলে এ কথা স্মরণ রাখে যে, আমরা একটি পৃথক মিল্লাত, স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। আমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমি ও উম্মতে মুহাম্মদীর সদস্য। আমাদের একটি নির্দিষ্ট শরীয়ত আছে, আইন আছে আর আমরা একটি আলাদা জীবন যাপন পদ্ধতির অনুসারী এবং আল্লাহ্‌র মুওয়াহ্‌হিদ তথা তৌহিদবাদী বিশ্বস্ত বান্দা। আমাদের জীবন-যিন্দেগী সেই আইন ও জীবন পথের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই পরিচালিত হবে এবং মৃত্যু যখন আসবে তখন সেই একই দীন ও মিল্লাতের ওপরই যেন আসে।

শিশুর জন্ম এবং তার কানে আযান ও একামত

কোন মুসলমানের ঘরে যখন কোন নবজাতকের আগমন ঘটে তখন সর্বপ্রথম তাকে খান্দানের কিংবা মহল্লা, গ্রাম ও এলাকার কোন বুযুর্গের খেদমতে নেওয়া হয়। তিনি তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত বলেন। এই আযান ও একামত (যার শব্দ ও অর্থ সালাত অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে) কেবল সালাতের জন্যই নির্দিষ্ট। আর নবজাতক শিশু সালাত তো দূরের কথা—এই আযান-একামতের মর্ম ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্য কিছুই বোঝে না। তাহলে তার কানে আযান-একামত বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, কোন কিছু পৌঁছুবার আগে শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র নাম এবং তাঁর ইবাদতের ডাক গিয়ে যেন পৌঁছে। এ সময় আল্লাহ্‌র কোন বুযুর্গ বান্দার চিবানো খেজুর কিংবা খোরমার একটি টুকরা বরকতের জন্য তার মুখে দেওয়া সাধারণভাবে প্রচলিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও তা সুন্নত হিসেবে প্রমাণিত আর এই সুন্নত সেখান থেকেই চলে আসছে।

শিশুর আকীকা ও তার তরীকা

জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর আকীকা করা মুস্তাহাব। কোন কারণে সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দ কিংবা একুশ দিনে (তাও সম্ভব না হলে যখন সম্ভব হয়)

আকীকা করা যায়। শিশু ছেলে হলে দু'টো ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ করা হয় এবং এর গোশ্‌ত গরীব মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করা হয় আর ঘরেও পাক করে খাওয়া ও খাওয়ানো হয়। আকীকা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরযও নয় আর ওয়াজিবও নয়, তেমনি ওয়াজিব নয় এসব পশু যবেহ করা। সামর্থ্য না থাকলে এটা জরুরীও নয়।

শিশুর নাম এবং এর ভেতর মুসলমানিত্বের প্রকাশ

সাধারণভাবে এ ধরনের আকীকার সুযোগে শিশুর নাম রাখা হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয়। অধিকাংশ সময় খান্দানের কোন নেককার বুযুর্গ কিংবা গ্রাম, মহল্লা ও মসজিদের কোন আলেম ও নেককার লোক দ্বারা নাম ঠিক করা হয় অথবা স্বয়ং শিশুর মাতা-পিতা কিংবা তার শ্রদ্ধাভাজন কোন ব্যক্তি আপন পছন্দমত কোন নাম নির্বাচন করেন। নাম রাখার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবী ধরনের নামকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যাতে করে শিশুর নামের দ্বারা মুসলমানিত্বের প্রকাশ ঘটে এবং নামের দ্বারাই যেন বোঝা যায় যে, লোকটি মুসলমান। মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ এর ভেতর বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা রয়েছে বলেন। বর্তমানে এমন কিছু দেশ আছে (যেমন চীন) যার বরাতে এইরূপ বাধ্যবাধকতা ও গুরুত্বের ওপর তারা জোর দিয়ে থাকেন। চীনে নাম থেকে বোঝা যায় না যে, লোকটি মুসলমান নাকি অমুসলমান। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত আইনগতভাবে মুসলমানদেরকে কোন বিশেষ নাম রাখার ব্যাপারে বাধ্য করেনি। কেবল এতটুকু দিক-নির্দেশনা দিয়েছে যে, সর্বোত্তম নাম তাই যদ্দ্বরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়াতের প্রকাশ পায়। এজন্য দুনিয়ার তাবৎ মুসলিম দেশের মুসলমানদের সেসব নামই বেশী রাখতে দেখা যায় যে সব 'আব্‌দ শব্দ সহযোগে শুরু হয়। যেমন আবদুল্লাহ্‌, আবদুর রহ্‌মান, আবদুল ওয়াহেদ, আবদুল আহাদ, আবদুস-সামাদ, আবদুল আযীয প্রভৃতি আল্লাহ্‌র সিফাতী তথা গুণবাচক নাম। রহ্‌মান অর্থ পরমদাতা, ওয়াহেদ অর্থ একাকী, আহাদ অর্থ এক, সামাদ অর্থ পরমুখাপেক্ষীহীন প্রভৃতি। আর একটি ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে তা হল-নামের দ্বারা শির্‌ক, অহংকার কিংবা অবাধ্যতা যেন প্রকাশ না পায়। আর এজন্যই মালিকু'ল-মুল্‌ক (রাজ্যের অধিপতি), শাহানশাহ (রাজাধিরাজ) জাতীয় নামকে পছন্দ করা হয়নি।

নামের বেলায় আম্বিয়া-ই-কিরাম ও সাহাবাদের নামকে অগ্রাধিকার প্রদান

নামের সিলিসিলায় একজন মুসলমানের মস্তিষ্ক সর্বপ্রথম স্বাভাবিকভাবেই আপন পয়গাম্বর, তাঁর জলীলু'ল-কদর সঙ্গী-সাথী, তাঁর পরিবারের শ্রদ্ধাভাজন ও

ভালবাসার পাত্রদের দিকেই যাবে এবং তারা বরকত ও সৌভাগ্য হিসেবে সেসব নামকেই অগ্রাধিকার দেয়।

নামের সিলসিলায় এটি একটি মজার ব্যাপার যে, যদিও মহানবী (সা)-এর বংশগত সম্পর্ক এবং মুসলমানদের বেশীর ভাগ মানসিক ও ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা ইসমাঈলী শাখার সঙ্গে এবং এও সত্য যে, বনূ ইসমাঈল ও বনূ ইসরাঈল (আরব ও ইয়াহূদী)-এর ভেতর দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য সেই সূচনা থেকেই চলে আসছে, কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্ প্রেরিত সকল নবী-রাসূল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁদের ওপর ঈমান আনা জরুরী, চাই কি নবী বনূ ইসমাঈল শাখার হোন কিংবা বনূ ইসরাঈল শাখার, সেজন্য মুসলমানরা নামের বেলায় কোনরূপ বংশগত সাম্প্রদায়িকতার শিকার নয়। আর এর ফলে কেবল উপমহাদেশেই লাখ লাখ এমন মুসলমান পাওয়া যাবে যাদের নাম ইসহাক (আ) ও তাঁর সন্তানদের নামে রাখা এবং তারা ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, দাউদ, সুলায়মান, মূসা, হারূন, ঈসা, ইমরান, যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া নামে কথিত হন। আর এঁরা সকলেই ইসরাঈলী শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঠিক তেমনি মহিলাদের ভেতরও মরিয়ম, সফূরা ও আসিয়া নামের সাক্ষাত মিলবে যাঁরা ইসরাঈলী শাখার সম্মানিত মহিলা ছিলেন।

পাক-পবিত্রতার তা'লীম

শিশু যখন কিছুটা বড় হয় এবং কিছুটা বোঝার মত বয়সে পৌঁছে তখন তাকে পাক-পবিত্রতার তা'লীম দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাকে পেশাব-পায়খানার পর পানির সাহায্যে পবিত্রতা হাসিল করতে, অপবিত্রতা তথা নাপাক বস্তুর হাত থেকে বাঁচতে এবং শরীর ও পরিধেয় কাপড়- চোপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক ও অপবিত্রতা থেকে বাঁচাতে বলা হয়ে থাকে। আর এটা তো পরিষ্কার যে, একটা শিশু পরিপূর্ণভাবে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে না এবং এক্ষেত্রে তার পরিবেশ, তা'লীম-তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং শিশুর পারিবারিক ঐতিহ্য ও পেশারও অনেকটা ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এরপরও একজন দীনদার ও ধর্মভীরু পিতা-মাতা এজন্য যত্ন নিয়ে থাকেন এবং নেওয়া উচিতও।

সালাতের তা'লীম ও তালকীন এবং এর বাস্তব অনুশীলন

এই বয়সে শিশুকে ওযু করা অর্থাৎ কিভাবে ওযু করতে হয় তা শেখানো হয় এবং তার ভেতর সালাতের প্রতি আগ্রহ জন্মানো হয়। বাপ কিংবা পরিবারের বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বী অধিকাংশ সময় শিশুকে হাত ধরে ও সাথে করে মসজিদে নিয়ে

যান এবং শিশু তার মুরুব্বী কিংবা মহল্লাবাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে সালাতের অনুকরণ করতে থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, শিশু যখন সাত বছরের হবে তখন তাকে সালাত আদায়ের জন্য বলবে আর দশ বছরে উপনীত হলে উপর্যুপরি জোর তাকীদ দিতে থাকবে এবং না পড়ার জন্য সতর্ক করবে।

ইসলামী আদব-কায়দার তা'লীম

এ বয়সেই দীনদার বাপ-মা ও শিক্ষিতা মায়েরা শিশুকে ইসলামী আদব-কায়দার তা'লীম দিয়ে থাকেন। যেমন সমস্ত ভাল কাজ (খানা খাওয়া, পানি পান, মোসাফাহা করা প্রভৃতি) ডান হাতে করা এবং নাক পরিষ্কার, পেশাব-পায়খানা থেকে শুরু করে ঢিলা-কুলুখ ও পানির সাহায্যে পাক-পবিত্র হওয়া ইত্যাদি বাম হাতে করা, পানি বসে পান করা, যতদূর সম্ভব তিন শ্বাসে পান করা, বড়দের সালাম করা, হাঁচি এলে আল-হামদুলিল্লাহ্ বলা, বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া, মাঝে মধ্যে লাকাল-হাম্দ ও লাকাশ-শোকর বলা এবং খাওয়ার শেষে আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া পেশ প্রভৃতির শিক্ষা শিশুকে তার ধর্মভীরু বাপ-মা দিয়ে থাকেন। এ বয়সেই তাকে কুরআন শরীফের ছোট ছোট সূরা এবং রোজকার দু'আ ও যিক্র-আযকার মুখস্থ করানো হয়। আল্লাহ্র নবী-রাসূল ও তদীয় নেক বান্দাদের জীবনের এমন সব ঘটনা ও কাহিনী শোনানো হয় শিশুদের যার ফলে তাদের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পাকাপোখ্ত, ধ্যান-ধারণা সৎ ও সুস্থ হয় এবং তারা তাঁদের আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য ভাবতে শেখে।

সাবালক হবার সাথে (সাধারণত ১৫ বছর বয়সকে সাবালকত্ব লাভের চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে ধরা হয়) তার ওপর সালাত ও সিয়াম এবং বিশেষ শর্তাধীনে হজ ও যাকাত ফরয হয়ে যায় এবং এসব পরিত্যাগ করলে তাকে গোনাহ্গার ভাবা হয়। এ সময় তার ওপর হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য ও শাস্তির বিধান জারী করা হয় এবং একজন দায়িত্বশীল ও বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের মতই সে নিজের কাজের, এই জীবনের ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জওয়াবদিহির উপযুক্ত হয়।

মাসনূন বিয়ে

ইসলামে বিয়ে-শাদী এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান হয় খুবই সংক্ষিপ্ত, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর। বিয়ে জীবনের এক অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চাহিদা এবং অন্যতম একটি ইবাদত হিসেবে তা সম্পাদিত থাকে। ইজাব ও কবুল— কেবল এই দু'টো শব্দ এবং দু'জন সাক্ষী এর জন্য অপরিহার্য। উদ্দেশ্য হল এই নিশ্চয়তা লাভ করা যে, নর-নারীর এই সম্পর্ক

আপত্তিকর ও অপরাধমূলক এবং গোপনীয় পন্থা ও লুকোচুরির বিষয় নয়। এজন্যই (অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক বিষয় এড়িয়ে) এটি প্রকাশ্যে ও লোকজনকে জানিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়াই বিধেয়। বিধেয়ই কেবল নয় জরুরীও বটে আর এর জন্য সাক্ষী প্রয়োজন। পুরুষ বিয়ের জন্য স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান ও তার জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও সম্ভ্রম রক্ষাকে জরুরী জ্ঞান করবে এবং তার খোরপোষের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে। বিয়ের জন্য এতটুকুই অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে, এর বেশী নয়।

ইসলামের ইতিহাসে এরও নজীর পাওয়া যাবে যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে মদীনার বুকে মুসলমানের সংখ্যা যখন খুবই স্বল্প, এর জনসংখ্যা যখন খুবই সীমিত, সাহাবীদের কেউ কেউ যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন, যাঁদের সঙ্গে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গভীর পারিবারিক ও দেশজ সম্পর্ক ছিল, মদীনায় বিয়ে করেছেন অথচ বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে (যাঁর অংশগ্রহণ বরকত ও ইজ্জতের কারণ হত) দাওয়াত প্রদান আবশ্যক মনে করেননি এবং এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের খবর তিনি অনেক পরে জানতে পারেন (দাওয়াত না করার জন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবীকে তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করেন নি কিংবা তাকে লজ্জাও দেননি, কেবল এতটুকু বলেছেন যেন এই উপলক্ষ্যে সে ওয়ালীমার আয়োজন করে)। বিয়ের সর্বাধিক মসনূন তরীকা হল এই যে, কনের পিতা কিংবা অপর কোন বৈধ অভিভাবক (ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় অভিভাবক বলতে বোঝায় কনের সেই পুরুষ আত্মীয় যিনি বুদ্ধিমান, বয়স্ক ও ওয়ারিশ হবার যোগ্যতা রাখেন। শরীয়ত তাকে কনে সম্প্রদায়ের অধিকার প্রদান করেছে) বিয়ে পড়াবেন। এজন্য যে, হযরত ফাতেমা (রাজী)-র সঙ্গে পড়িয়েছেন। এ সময় দুইজন সাক্ষী ও একজন উকীল (যিনি কারুর নির্দেশ বা অনুমতিক্রমে তার প্রতিনিধি হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অধিকার পান) কনের কাছে গিয়ে কনেকে অবহিত করেন যে, তার বিয়ে এত দেনমোহরে অমুকের সাথে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত মৌনতার মাধ্যমেই এর জওয়াব দেওয়া হয় এবং একেই সম্মতির লক্ষণ বা সমার্থক বলে ধরা হয়ে থাকে। দু'জন সাক্ষী ও উকীল সাধারণত পরিবারের সদস্য ও কনের নিকটাত্মীয় হয়ে থাকেন। অতঃপর যিনি বিয়ে পড়াবেন তিনি বুলন্দ আওয়াজে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত, কয়েকটি হাদীস ও আরবীতে কিছু খুতবা পাঠ করেন যাকে বিয়ের খুতবা বলা হয়। এরপর আসে ঈজাব-কবুলের পালা। এর নিয়ম হল নিম্নরূপঃ উকীল বরকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ আমি আমার মুওয়াক্কিলা (উকীল কনের পিতা হলে বলবেন, আমি আমার কন্যা) অমুকের কন্যা অমুককে

(প্রথম অমুকের স্থলে পিতার নাম এবং দ্বিতীয় অমুকের স্থলে কনের নাম বলতে হবে) এত টাকা দেনমোহরে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। তুমি কি কবুল করলে? পরক্ষণে বর এতটা জোরে যাতে আশেপাশের লোক শুনতে পায় বলবেন, "আমি কবুল করলাম"। এরপর কাযী ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মেহমানবৃন্দ দো'আর জন্য হাত উঠান ও দো'আ করেন যাতে নব-দম্পতির মধ্যে প্রেম-প্রীতির সঞ্চার হয় এবং তাদের দাম্পত্য জীবন সফল হয়, সুখের হয়। সাধারণত বিয়ের খুতবা আরবী ভাষায় পঠিত হয়ে থাকে।

বিয়ের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের আলোচনা

কিছুকাল আগে থেকে অনেক আলিম-উলামা খুতবার আরবী অংশ এবং কুরআনুল করীমের আয়াত পাঠ করার পর মাতৃভাষায় (ভারত ও পাকিস্তানে উর্দূ এবং বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়) সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেছেন। এ বক্তৃতায় বিয়ের তাৎপর্য এবং এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়ে থাকে এবং চেষ্টা করা হয় যাতে করে বিয়ের অনুষ্ঠান একটি প্রথা ও খেলা ধুলার বস্তুতে পরিণত না হয়। এ থেকে বর ও মজলিসে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ যেন ধর্মীয় ও নৈতিক পয়গাম পান এবং তাদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়।

বিয়ে

এখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার নমুনা পেশ করা হচ্ছে। এটি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান থেকে রেকর্ড করা হয়েছিল যা এই পারিভাষিক পদ্ধতির অনেকটাই প্রতিনিধিত্ব করে।

(মাসনূন খুতবার পর)

আ'উযু বিল্লাহি মিনা'শ-শায়তানি'র-রাজীম।

বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র-রাহীম।

"(আল্লাহ পাক বলেন) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গীনি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (৩ ঃ ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) না হয়ে কোন অবস্থায় মরিও না।" (৩ ঃ ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (৩৩ ঃ ৭০-৭১)

সুধীমণ্ডলী!

এই বিয়ে কেবল রসম-রেওয়াজের পাবন্দী কিংবা শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের নাম নয়। বিয়ের সুন্নত একটি ইবাদত শুধু নয় বরং এ অনেকগুলো সুন্নতের সমষ্টি। এ কেবল একটি শরঈ হুকুম নয়, ডজনখানেক বরং বিশটিরও অধিক শরঈ হুকুম এর সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত। এর জন্য সম্মানজনক স্থান ও মর্যাদা কুরআন শরীফেও আছে, হাদীসপাকেও আছে। ফিক্হের কিতাবাদিতে তো এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। কিন্তু সুন্নত সম্পর্কে গাফিলতি ও উদাসীনতা এতটা ব্যাপক যতটা আর কোন সুন্নত ও ফরয সম্পর্কে নয় বরং একে আল্লাহ্র নাফরমানী, নফ্সের অহমিকা, শয়তানের অনুসরণ ও রসম-রেওয়াজের পাবন্দীর ক্ষেত্র বানানো হয়েছে। এর ওপর আমাদের জীবন-যিন্দেগীর জন্য পূর্ণ পয়গাম রয়েছে। এর পরিমাপ কুরআন শরীফের সেই আয়াত থেকেই করতে পারবেন যা পাঠ করা বিয়ের খুতবায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকেই প্রমাণিত যা প্রথমেই ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মানবজাতির প্রারম্ভের আলোচনা করা হয়েছে যা এই মুবারক মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও সৌভাগ্যসূচক যে, হযরত আদম (আ) তো একাই ছিলেন সৃষ্টিতে, আদিতে একজনই ছিলেন আর তাঁর ছিল একজন জীবন-সঙ্গিনী যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি মানুষ দিয়ে গোটা পৃথিবী ভরে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ দু'জনের মধ্যে এমন প্রেম ও প্রীতির সঞ্চার করলেন এবং তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে এমন বরকত দান করলেন যার সাক্ষ্য দিচ্ছে আজ সারা পৃথিবী। তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কি এমন কঠিন কিছু যে, তিনি এই নব দম্পতিযুগল-যারা আজ পরস্পর মিলিত হচ্ছে-তারা একটি গোষ্ঠী আবাদ করবে এবং একটি পরিবারকে সফল ও সুখী করবে। এরপর আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সেই প্রভু- প্রতিপালককে লজ্জা কর যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রার্থনা কর, চেয়ে থাক।

সুধীবৃন্দ!

গোটা জীবনটাই তো অব্যাহত ও পরিপূর্ণ প্রার্থনা, চাওয়া। ব্যবসা বলুন, হুকুম বলুন, শিক্ষা বলুন সবই এক ধরনের প্রার্থনা ও যাচনা। এসবের ভেতর একপক্ষ প্রার্থী আর অপর পক্ষ প্রার্থনা পূরণকারী। এটা সভ্য সমাজের ও সভ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই বিয়ে বা আক্‌দ, এটা কি? এটাও সভ্য, ভদ্র ও বরকতময় প্রার্থনা। একটি শরীফ খান্দান আরেকটি শরীফ খান্দানের কাছে যেয়ে বলে যে, আমাদের কলিজার টুকরো নয়নের পুত্তলির জন্য একজন সঙ্গী/সঙ্গিনী প্রয়োজন। তার জীবন-যিন্দেগী অপূর্ণ, তাকে পূর্ণতা দিন। অপর শরীফ খান্দান অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ও খুশী-খোশালীতে সেই চাওয়া তথা সেই প্রার্থনা কবুল করেন। এরপর তারা উভয়ে মাঝখানে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যে দু'জন গতকাল পর্যন্তও পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল, যে সবচে' বেশী দূরের মানুষ ছিল আজ তারাই পরস্পরের সবচে' বেশী কাছাকাছি, সবচে' বেশী পরিচিত যার চেয়ে বেশী কল্পনাও করা যায় না। একজনের ভাগ্য অন্যের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। একের আনন্দ অপর জনের আনন্দের ওপর নির্ভরশীল। এ সবই আল্লাহ্‌র নামের ক্যারিশমা যিনি হারামকে হালাল, নাজায়েযকে জায়েয, অলসতা ও অবাধ্যতাকে আনুগত্য ও ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন এবং যিন্দেগীর ভেতর এক মহা বিপ্লব সাধন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এখন তোমরা এর মর্যাদা রক্ষা করবে। এটা বড়ই স্বার্থপরতা হবে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নাম মাঝে রেখে নিজের স্বার্থ হাসিলে লেগে যাও, তিনি আমাদের কাছে যা চান, আমাদের কাছে তাঁর যা দাবি তা যদি আমরা পূরণ না করি। আজকের মতো ভবিষ্যতেও তাঁর নাম স্মরণ করবে, তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান হবে।

এরপর তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান হবে। "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে।" আজ একটি নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন পড়েছে প্রাচীন সম্পর্কের উল্লেখের, যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের চেয়েও প্রাচীন যা এই সম্পর্ক দ্বারা দূর হচ্ছে না, তার অধিকারসমূহ খতম হয়ে যাচ্ছে না। এমন যেন না হয় যে, স্ত্রীর সম্পর্ক মনে রাখলে আর মায়ের সম্পর্ক ভুলে গেলে। শ্বশুরের খেদমতকে জরুরী জ্ঞান করলে, অথচ আপন জন্মদাতা পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। না, এমন যেন না হয়। কখনো নয়। যদি কখনো কারুর মনে এ ধারণার উদয় হয় যে, এমন করলেই বা কি? কে দেখবে এসব আর কেই বা আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা পাহারাদার হিসেবে আমার কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখবে? তাই বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের উপর

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" আল্লাহ্ তার ওপর নজর রাখছেন। তিনিই সর্বদা তার সাথে থেকে তার যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষী হবেন। (আল্লাহ্ বলেন) "আমি তার ঘাড়ের শাহরগ অপেক্ষাও কাছে।" (৫০ ঃ ১৬)

দ্বিতীয় আয়াতে একটি তিক্ত কিন্তু অনিবার্য বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি আল্লাহ্র পয়গাম্বরের শান যে, এমন আনন্দঘন ও খুশীর মাহ্ফিলেও এ ধরনের তিক্ত সত্যের উল্লেখ করেন যাতে মানুষ নিজের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন হতে না পারে এবং সেই সম্পদের প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে যা তার সাথে যাবে এবং চিরদিন তার সাথে থাকবে আর তা হল ঈমানী সম্পদ। তিনি বলেন যে, এই জীবন যতই হাসি-খুশীভরা হোক, যতই আনন্দঘন হোক, সৌভাগ্যপূর্ণ হোক, আর তা হোক না যতই দীর্ঘ, এর শেষ আছে। সেই সমাপ্তি যেন আনুগত্যের মাঝ দিয়ে হয়, ঈমান ও ইয়াকীনের ওপর হয়। একথা তাকে মনে রাখতে হবে, তাকে ভাবতে হবে। এটাই সেই পরম সত্য যা দুনিয়ার একজন সফলতম মানুষ, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ, পরিপূর্ণতা, সম্পদ ও সৌভাগ্য, পদ ও পদমর্যাদা, সর্বোত্তম গুণাবলী ও সৌন্দর্যের আধার দ্বারা ধন্য ও ভূষিত করেছিলেন, সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেও ভোলেন নি।

এরপর শেষ দিকে উপস্থিত সকলে বরের মুখ থেকে যখন সেই মুবারক শব্দ "আমি কবুল করলাম" শোনার জন্য উদগ্রীব, — তার আগে কুরআন শরীফ এই পয়গাম শোনায় যে, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য সঠিক ও যথার্থ কথা বল।" এ যেন বরকে বলা হচ্ছে যে, সেই মুহূর্তে যা সে বলতে যাচ্ছে, তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত শব্দসমষ্টির গুরুত্ব ও যিম্মাদারী এবং এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি, অনুভব করে সে যখন বলবে যে, "আমি কবুল করলাম" তখন যেন সে বুঝতে চেষ্টা করে যে, সে কত বড় ইকরার করছে এবং এর দ্বারা তার ওপর কত বড় যিম্মাদারী অর্পিত হচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে যে, কেউ যদি এ ধরনের মেপেজুখে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় এবং তার ভেতর স্থায়ীভাবে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তার গোটা জীবন, তার কথাবার্তা ও কাজকর্ম সবই সত্য ও সততার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে এবং সে একজন আদর্শ কর্মী-পুরুষে পরিণত হবে এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও রেযামন্দীর হকদার হবে। অতঃপর এই পয়গাম এই কথার ওপর সমাপ্ত করেছেন যে, প্রকৃত সাফল্য আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত, নফ্সের আনুগত্যের মধ্যে নয়, রসম-রেওয়াজের পাবন্দীর মধ্যে নয়।

বিয়ের খুতবা ও ইজাব কবুলের পর উপস্থিত লোকদের মধ্যে খোরমা বিতরণ করা হয় ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের মাহ্ফিলে এটি প্রাচীনতম সুন্নাহ বা রীতি।

দাম্পত্য জীবন যাপন একটি ইবাদত

ইসলামে দাম্পত্য সম্পর্ককে জীবনের একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবেই কেবল দেখা হয়নি বরং একে একটি ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যদ্দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে দাম্পত্য সম্পর্কের, বৈবাহিক সম্পর্কের অর্থ এই নয় যে, জীবনের প্রয়োজনের আওতায় এটা করারই দরকার ছিল এবং এ ছাড়া জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ লাভ হয় না বরং একে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে এবং এরই নিমিত্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় যিন্দেগীতে এর সর্ববৃহৎ নমুনা পেশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক সে-ই যে আপন পরিবারস্থ লোকদের নিকট সর্বোত্তম এবং আমি আমার নিজের পরিবারের লোকদের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

অনন্তর আপনি যদি নবী করীম (সা)-এর সীরাত মুবারক অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে, তাঁর মধ্যে মহিলাদের প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ইন্‌সাফ কায়েমের যেই নজীর তিনি দেখিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই।

কেবল তাঁদের সঙ্গেই নয় বরং বাচ্চা-শিশুদের সঙ্গেও তিনি কোমল ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। এমনকি সালাতের মত প্রিয়তম আমলকেও তিনি কেবল এজন্য সংক্ষিপ্ত করতেন যাতে কোন মায়ের কষ্ট না হয়। বাচ্চা-শিশু কাঁদলে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। এ ছিল তাঁর সর্বোচ্চ দর্জার কুরবানী। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট সালাতের চেয়ে বড় কিছু ছিল না। এর চেয়ে বড় কোন কুরবানী হতে পারত না। তিনি বলতেন, কোন কোন সময় মন চায় সালাত দীর্ঘ করি। কিন্তু বাচ্চা কিংবা শিশুর কান্নার আওয়াজ কানে আসতেই আমার ধারণা হয় যে, না জানি তার মায়ের কষ্ট হচ্ছে, তার মন বাচ্চার চিন্তায় পেরেশান হচ্ছে, আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিই।

জীবনের অনিবার্য স্বাভাবিক পর্যায়সমূহ এবং মুসলমানদের নির্দিষ্ট কর্মপন্থা

এখন এই শুভ ও আনন্দঘন অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত হয়ে আসুন আমরা মুসলমানদের জীবনে সংঘটিতব্য স্বাভাবিক পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি যা মানুষ মাত্রেরই জীবনে এসে থাকে।

রোগ-শোক ও অসুখ-বিসুখ মানুষের জীবনে লেগেই আছে। এ যেন তার র নিত্য সঙ্গী। একজন মুসলমানের জন্য এমতাবস্থায়ও সালাত মাফ হয় অবশ্য ‹সলামী শরীয়ত এ ব্যাপারে রোগী তথা অসুস্থ ব্যক্তিকে অনেক

রেআয়েত করেছে। যেমন যদি সে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় না করতে পারে তবে সে এই ফরয ইবাদতটি ঘরে বসেই আদায় করতে পারে। যদি দাঁড়িয়ে আদায় করতে না পারে তবে বসে, না পারলে শুয়ে, যদি শুয়েও আদায় করতে না পারে তাহলে ইশারা-ইঙ্গিতে সালাত আদায় করতে পারে। যদি পানির ব্যবহার তার জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে। তবুও যথাসম্ভব পবিত্রতা হাসিলের ইহ্তিমাম জরুরী।

রোগী পরিদর্শন করা ইসলামে বিরাট ছওয়াবের কাজ বলে স্বীকৃত। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে, রোগীর কাছে যেন কেউ বেশিক্ষণ না বসে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে সত্বর রোগীর থেকে বিদায় নেবে। অধিক সময় বসলে ও লম্বা গল্প জুড়লে কিংবা দীর্ঘ আলাপে রোগী হাঁপিয়ে ওঠে। এতে রোগীর কষ্ট হয়। তাছাড়া যিনি সেবা-শুশ্রূষায় আছেন তারও কষ্ট হয়। অবশ্য রোগীর কাছে বেশিক্ষণ অবস্থান করা যদি রোগীর পছন্দনীয় হয় এবং তার চিত্তের ব্যথা উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তবে ভিন্ন কথা।

জীবনের অনিবার্য মৃত্যু এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের করণীয় পন্থা

মানুষের জীবনে শেষ পর্যন্ত সেই পর্যায়ও এসে উপস্থিত হয় যার হাত থেকে পালাবার কোন পথ নেই। এক্ষেত্রে ধর্ম-গোত্র, জাতি-সম্প্রদায়ের কোন পার্থক্য নেই আর তা হল মৃত্যুর অনিবার্য পর্যায়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের বাড়িতে কি হয় এবং এর নির্দিষ্ট পন্থা ও করণীয় কাজের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে পেশ করা হল।

মৃত্যু চিন্তা ও এর প্রস্তুতি

একজন মুসলমানকে আমলে ও রূহানী দিক দিয়ে তার অবস্থানগত মর্যাদা খুব বেশী উঁচু ও বিশিষ্ট না হলেও মৃত্যুর চিন্তা কমবেশী ঘিরে রাখে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানই চায় দুনিয়া থেকে সে যেন ঈমানের সাথে যেতে পারে এবং তার শেষ নিঃশ্বাসটি যেন কলেমায়ে শাহাদত, তাওহীদ ও রিসালতের আকীদার ওপর হয়। মুসলিম সমাজে, বিশেষত যেখানে কিছুটা ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব রয়েছে, পরকালের চিন্তার প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে, যখনই কোন মুসলমান আরেক মুসলমানের নিকট দো'আর দরখাস্ত করে কিংবা কেউ যখন আল্লাহ্র কোন নেককার বুযুর্গ বান্দার সাক্ষাত লাভে ধন্য হয় তখনই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে যে, দো'আ করবেন যেন ভালোয়

ভালোয় আমার মৃত্যু হয়, আমার শেষ পরিণতি যেন ভাল হয়। আর একেই একজন সাধারণ মুসলমান সবচে 'বড় সৌভাগ্য ও সফলতা মনে করে এবং তাকে সবচে' বেশী ঈর্ষাযোগ্য মনে করে যদি কোন মুসলমান কলেমা পাঠ করতে করতে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। মুসলমানের যখন মৃত্যু ক্ষণ ঘনিয়ে আসে এবং মৃত্যুর সকল লক্ষণ তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে সেই মুহূর্তে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও চারপাশের উপস্থিত লোকজন তাকে কলেমার তালকীন করতে থাকে। অর্থাৎ এ সময় সে (মৃত্যুপথ যাত্রী) কলেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌) পাঠ করবে কিংবা শুধু আল্লাহ্‌র নাম নিতে থাকবে। যদি মুখ না চলে, দুর্বলতা বেশী দেখা দেয় কিংবা বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় তবে তাকে পড়াবার পরিবর্তে উপস্থিত লোকজন নিজেরাই কলেমা পড়বে অথবা আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিক্‌র করতে থাকবে। যদি বোঝা যায় যে, তার গলা শুকিয়ে আসছে তাহলে যমযমের পানি (অবশ্য যদি ঘরে থাকে) কিংবা শরবত অথবা ফলের রস মৌসুম মাফিক, অন্যথায় শুধুই পানি ফোঁটা ফোঁটা করে দেওয়া হয়। কাছের লোকেরা এ সময় সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা শুরু করে। কেননা এ সময় সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য খুবই উপকারী। হাদীসে এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এরপর মৃত্যু একেবারেই ঘনিয়ে এলে কিংবা প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে মৃতকে কেবলামুখী করে দেওয়া হয়।

মৃতের কাফন-দাফন

ইন্তিকালের পর মৃতের গোসলের প্রস্তুতি ও কাফনের ব্যবস্থা শুরু হয়। কাফন হিসেবে নতুন পাক-পবিত্র ও সাদা কাপড় ব্যবহৃত হয়। পুরুষের কাফন হিসাবে একটি সেলাইবিহীন কোর্তা, একটি তহ্‌বন্দ ও ওপরের চাদর দেওয়া হয়। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়াও মস্তক ও বক্ষ বন্ধনী হিসাবে অতিরিক্ত দু'টো কাপড় দেওয়া হয়। গোসল দেওয়ার বিশেষ নিয়ম আছে যার বিস্তারিত বিবরণ মসলা-মাসায়েল বই- পুস্তকে বর্ণিত আছে। গোসল যে কোন মুসলমানই দিতে পারে। নেককার লোক দ্বারা, যিনি মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ-গোসল দেওয়াকে উত্তম জ্ঞান করা হয়। এ সময় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন প্রিয়জনের শেষ খেদমত করতে পারাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করে থাকে।

নামাযে জানাযা

জানাযা তৈরি হলে জানাযার নামায শুরু হয়। এতে শরীক হওয়া খুবই ছওয়াবের কাজ। জানাযার নামায জামাত সহকারে আদায় করা হয়। এই নামাযে রুকু সিজ্‌দা থাকে না। উপস্থিত লোকজন কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কাতারের সংখ্যা হয় বেজোড় সংখ্যক। কোন আলেম কিংবা নেক্‌কার মানুষ অথবা মহল্লা বা গ্রামের মসজিদের ইমাম সাধারণত জানাযার নামায পড়িয়ে থাকেন। তিনি কাতার থেকে সামনে কিছুটা অগ্রসর হয়ে জানাযা সামনে নিয়ে মৃতের সীনা বা বুক বরাবর দাঁড়িয়ে যান। এরপর নামায শুরু হয়। এই নামাযে চারটি তকবীর। দোআ-দরূদ চুপে চুপে পড়া হয়। নিয়তের পর প্রথম তকবীরের পরে সেই দোআ পড়া হয় যে দোআ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমার পর পড়া হয়। দ্বিতীয় তকবীরের পর দরূদ শরীফ পড়া হয়। তৃতীয় তকবীরের পর সকলেই নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করে ঃ

"আল্লাহুম্মাগফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ'ইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহ্'ইহি 'আলা'ল-ইসলাম; ওয়া মান তাওয়াফফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলা'ল-ঈমান।"

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ক্ষমা কর আমাদের জীবিতদের, আমাদের মৃতদের, উপস্থিতদের ও অনুপস্থিতদের, ছোটদের ও বড়দের, আমাদের পুরুষদের ও নারীদের। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের ওপর জীবিত রেখো। আর যাকে আমাদের মধ্যে মৃত্যুদান করবে তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিও।

জানাযা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হলে অন্য দোআ পড়া হয় যার অর্থ নিম্নরূপঃ "হে আল্লাহ! এই শিশুকে আমাদের অগ্রবর্তী, আমাদের জন্য পুরস্কার, সঞ্চয় ও সুপারিশকারী বানাও যখন সুপারিশ তুমি কবুল করবে।"

জানাযার খাটিয়া কাঁধে কবরস্থানে গমন

চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফেরানো হয়। এরপর জানাযার খাটিয়া কাঁধে উঠিয়ে কবরস্থানে নেওয়া হয়। ইসলামী শরীয়তে জানাযার খাটিয়ায় কাঁধ লাগানো, তাকে তার শেষ বিশ্রামস্থল (কবর) অবধি পৌছানো এবং তাকে দাফন করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার বিরাট ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিরাট ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এজন্য সাধারণভাবে সকলেই জানাযা কাঁধে বহনের জন্য চেষ্টা করে এবং কবরস্থানের দূরত্ব যতই হোক না কেন, রৌদ্র বৃষ্টি যাই

থাকুক, জানাযা হাতে হাতে ও কাঁধে কাঁধে খুব তাড়াতাড়িই কবরস্থানে পৌঁছে যায়। বর্তমান নগর জীবন ও সভ্যতায় বড় বড় শহরগুলোতে কবর দূরে অবস্থিত হওয়ার দরুন মোটর কিংবা ট্রাকে করে জানাযা নেবার রীতি শুরু হয়েছে। কবরস্থানের অস্বাভাবিক দূরত্বের কারণে বাধ্য না হলে উপরিউক্ত তরীকাই মাসনূন তরীকা যা বর্ণিত হল।

মৃতকে মাটিতে রাখার নিয়ম ও মাটি দেবার তরীকা

কবর সাধারণত আগেই তৈরি করা হয়। জানাযা এসে পৌঁছুতেই কয়েকজন কবরের ভেতর নামেন এবং মৃতকে কেবলামুখী করে কবরে নামানো হয়। এর ওপর অতঃপর বাঁশ, কাঠ কিংবা তক্তা রেখে তার ওপর মাটি ফেলা হয়। এই মাটি ফেলাকে "মুর্দাকে মাটি দেওয়া" বলা হয়। মাটি দেবার সময় অধিকাংশের মুখে থাকে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ

"মিনহা খালাক্'নাকুম ওয়া ফীহা নুয়িদুকুম ওয়া মিন্হা নুখ্রিজুকুম তারাতান্ উখ্রা।"

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এই মাটি থেকেই পয়দা করেছিলাম আর এরই ভেতর তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এর থেকেই তোমাদেরকে আবার বের করে আনব (সূরা তাহা ঃ ৫৫)।

এরপর তা কবর আকার ধারণ করে এবং উটের পৃষ্ঠদেশের মতো আকৃতি পায়। এ সময় সম্পর্কিত লোকজন আরও কিছুক্ষণ অবস্থানপূর্বক মৃতের জন্য মাগফিরাতের দোআ করতে থাকে, কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়। এটা সুন্নাত।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের লোকদের জন্য খাবার প্রেরণ ও শোকে অংশগ্রহণ

যখন বাড়িতে কেউ মারা যায় এবং লোক শোকাভিভূত হয় তখন সাধারণভাবে সেদিন আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি-ঘর থেকে শোকাহত বাড়ির লোকদের ও তাদের বাড়িতে আগত লোকজনের জন্য খাবার পাঠানো হয়। এই প্রথা চলে আসছে এই ধারণায় যে, মৃতের বাড়ির লোকদের সেদিনের মানসিক অবস্থা খাবার পাকানোর মত থাকে না। এজন্য রান্না-বান্নার চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখা হয়। মূলত এটি একটি সুন্নত যা আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে চলে আসছে। মৃত্যের অবস্থানগত মর্যাদা ও তার সম্পর্ক মাফিক তিন ওয়াক্ত কিংবা তিনদিন আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে খাবার পাঠানো হয় এবং সকলে মিলে খেয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) কেবল 'আকীদা-বিশ্বাস ও শরঈ জীবন-বিধান, কেবল একটি নতুন ধর্ম ও দীন ইসলামেরই দাওয়াত দেন নি বরং তাঁরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নতুন জীবন-পদ্ধতি তথা নতুন জীবন-ধারারও প্রবর্তক হয়ে থাকেন যাকে রব্বানী তথা ঐশী সভ্যতা বলা যায়। এই সভ্যতার কিছু নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে, রয়েছে সুনির্দিষ্ট বুনিয়াদ, পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন যেগুলোর সাহায্যে তাকে অপরাপর সভ্যতা ও জাহিলী সংস্কৃতি থেকে সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য করা যায়। আর এই পার্থক্য তার মূল প্রাণসত্তা ও বুনিয়াদের ক্ষেত্রে যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি ফুটে ওঠে তার বহিরাবয়বের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাতেও।

মুসলিম সভ্যতার প্রথম মৌল উপাদান হল তার ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী জীবন-যিন্দেগীর মৌল নীতিমালা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানসমূহ। এই মৌল উপাদান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নানা প্রান্তের মুসলমানদের সভ্যতার সাধারণ ও সম্মিলিত অংশ। মুসলমান দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলেরই হোক না কেন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই সে বসবাস করুক না কেন এবং তার ভাষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ যাই হোক, তাদের ভেতর এগুলোর ব্যাপারে সাধারণ সাযুজ্য ও মিল অবশ্যই পাওয়া যায়। এরই ভিত্তিতে তারা একই পরিবারের সদস্য এবং সর্বত্র তাদের একই সভ্যতার ধারক হিসেবে দেখা যায়। এই সাধারণ ও মিলিত উপাদানের দিক দিয়ে দুনিয়ার সকল মুসলমান একটি সুনির্দিষ্ট সভ্যতার ধারক যার জন্য 'ইবরাহীমি সভ্যতা'র চেয়ে অধিক উপযোগী ও ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই।

ইবরাহিমী মুহাম্মদী সভ্যতা

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) সেই আল্লাহ-পরস্ত সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম ছিলেন, যার বুনিয়াদ আল্লাহ্র ওয়াহ্দানিয়াত তথা একত্ববাদ, তার ওপরে ঈমান ও এর আলোচনা, সরল প্রকৃতি ও সুস্থিত চিত্র, আল্লাহ তা'আলার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ, তাক্ওয়া ও পরহেযগারী, মানব জাতির প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন এবং মানুষের সুস্থ রুচির ওপর রাখা হয়েছে।

ইবরাহিমী আখলাক-চরিত্র ও জীবন যাপন পদ্ধতি এই সভ্যতার শিরা-উপশিরায় অনুপ্রবিষ্ট যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী" (সূরা হুদ ঃ ৭৫)।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল" (সূরা তাওবা ঃ ১১৪)।

হযরত ইবরাহীম (আ) এক দিকে এই সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম , যিনি ছিলেন তাঁরই বংশের উত্তরাধিকারীও, এই সভ্যতার সংস্কারক ও পূর্ণতা দানকারী, যিনি এই সভ্যতার নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং এর ভেতর স্থায়ী হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তিনি এর মূলনীতি ও স্তম্ভসমূহ এমনভাবে সুদৃঢ় করেন যা একে স্থায়ী ও বিশ্ব সভ্যতার রূপ দান করে।

ইবরাহিমী সভ্যতার তিনটি বৈশিষ্ট্য

ইবরাহীমি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ এক, আল্লাহর সত্তায় নিশ্চিত বিশ্বাস এবং তাঁকে সার্বক্ষণিক হাযির-নাজির জ্ঞান করা। দুই, তাওহীদি আকীদা-বিশ্বাস (যেমন ইবরাহিমী সিলসিলার নবীগণ শিক্ষা দিয়েছেন এবং-এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআন মজীদে পাওয়া যায়)। তিন, শরাফত ও মানবীয় সাম্যের অপরিহার্য স্থায়ী ধারণা যা কোন মুসলমানের মস্তিস্ক থেকে পৃথক কিংবা বিচ্ছিন্ন হয় না। এগুলোই সেই সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেসব বৈশিষ্ট্য ইবরাহিমী সভ্যতাকে দুনিয়ার অপরাপর সভ্যতার মুকাবিলায় একটি নতুন রূপ দান করে। এসব বৈশিষ্ট্য এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বলভাবে, আমাদের জানা মতে, আর কোন সভ্যতায় পাওয়া যায় না।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : মুসলমানের জীবনে আল্লাহ্র স্মরণ

আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় এবং অব্যাহত ও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে হাযির-নাজির জানা ও এর প্রকাশ এমন এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা মুসলমানদের সমগ্র সভ্যতা ও গোটা জীবনের সাথী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলমানদের সমাজ ও সভ্যতাকে বিভিন্ন আকার ও সাইজের পোশাক হিসেবে কল্পনা করুন যার ভেতর বিভিন্ন রকমের স্বাদ ও রুচি, স্থানীয় হালত, মৌসুমী তথা আবহাওয়াগত পরিবর্তন ও বাইরের প্রভাব ক্রিয়াশীল। কিন্তু ঐসব পোশাককে যেন একই রঙের ভেতর চুবানো হয়েছে এবং এখন আর সেসবের কোন সূতাই এমন নেই যা সেই রঙে রঞ্জিত না হয়েছে। আল্লাহ্র নাম এবং

তাঁর যিক্‌র মুসলিম সমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি শিরা-উপশিরার ভেতর রক্তের ন্যায় অব্যাহতভাবে সঞ্চালিত। মুসলিম পরিবারে যখন কোন শিশুর জন্ম হয় তখন সর্বপ্রথম তার কানে আযান দেওয়া হয় আর এভাবে সর্বপ্রথম এমনকি স্বয়ং শিশুর নামের আগে যেই নামের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানো হয় তা আল্লাহ্‌রই নাম। শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে সুন্নত তরীকা মুতাবিক তার আকীকা করানো হয়, তার ইসলামী নামকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে সেসব নামকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় যেসব নামের মধ্যে নিজের গোলামী এবং আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের ওয়াহ্‌দানিয়াতের ঘোষণা থাকে অথবা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ তওহীদবাদী সম্প্রদায় (আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম এবং তাঁদের অনুসারীবৃন্দ)-এর ভেতর কারুর নামে নাম রাখা হয়।

লেখা-পড়া শেখাবার সময় এলে মকতবের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এ সময় আল্লাহ্‌র নাম এবং কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারাই এর উদ্বোধন করা হয়। এই প্রথা আজও উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে 'তাসমিয়া খানী' বা 'বিসমিল্লাহ খানী' নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। এরপর আসে বিবাহ পর্ব। এখন দু'জন দায়িত্বশীল মানব সত্তাকে স্থায়ীভাবে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে দেবার লক্ষ্যে পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম উভয়ের মাঝে টেনে আনা হয় এবং এই নামের মর্যাদা ও সম্মান যাতে রক্ষিত হয় সেজন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

"আল্লাহ্‌কে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট সওয়াল করে থাক এবং আত্মীয়তা সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা কর" (সূরা নিসা)। সুন্নত তরীকা মাফিক বিয়ের যে খুতবা পাঠ করা হয় তার ভেতর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আলোচনা হয় যিনি আদম সন্তানদের ভেতর নারী-পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন। এরপর আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী তথা আনুগত্যাধীনে বাঁচা-মরার তালকীন দেওয়া হয়। ঈদের বরকতময় ও আনন্দঘন মুহূর্তও মুসলিম সমাজ সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। ঈদের দিন মুসলমানদেরকে সকাল সকাল গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পাক সাফ কাপড় পরে আল্লাহ্‌র নামের মহিমা ও বড়ত্ব গাইতে গাইতে (তকবীরে তাশরীক উচ্চারণ করতে করতে) ঈদগাহে যাবার ও দু'রাকআত শোকরানা সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈদুল আযহায় আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

জীবনের অন্তিম ও অনিবার্য মনযিল এলে তখনও তাঁর পবিত্র নামের তালকীন করা হয়। প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের সবচে' বড় অভিলাষ, বড় আকাঙ্ক্ষা থাকে, চেষ্টা থাকে, তার শেষ শব্দটি যা তার মুখ দিয়ে বের হবে তা এই পাক-পবিত্র নামটিই যেন হয় এবং এই নামটি উচ্চারণ করতে করতেই যেন

সে এই নশ্বর ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে পারে। তার ইন্তেকালের খবর শুনতেই লেখা-পড়া জানা যে কোন মুসলমানের মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যে শব্দটি বেরিয়ে আসে তা হল কুরআন মজীদের সেই বিখ্যাত ও বহুল পরিচিত একই সঙ্গে নিত্য ব্যবহৃত আয়াতে কারীমা যা উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনের দৈনন্দিন শব্দভাণ্ডারেরই অন্তর্গত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' (আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন)। যখন সর্বশেষ খেদমত ও বিদায়ের (নামাযে জানাযা) মুহূর্ত এসে যায় তখনও এর ভেতর প্রথম থেকে শেষ অবধি আল্লাহ্‌র নামই থাকে। মৃতের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের দু'আ এবং নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদারী তথা আনুগত্যের ওপর বাঁচা ও ঈমানের সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার দু'আ করা হয়। যখন মৃতের লাশ কবরে নামানো হয় এবং শেষ শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয় তখনও এই কথা বলে কবরে নামানো ও শোয়ানো হয় যে, আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে এবং তাঁর পয়গম্বরের মিল্লাত ও মযহাবের ওপর রাখা হচ্ছে। কবরে রাখার সময় তার মুখ ইবাদত ও তাওহীদের সেই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের অভিমুখী করা হয় যাকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ঘর (কা'বা) বলা হয়। একজন মুসলমান দুনিয়ার যে প্রান্তেই মারা যাক না কেন এবং তাকে যেখানেই দাফন করা হোক তার মুখ কা'বার দিকেই থাকবে। তাকে দাফন করার পর যখন কোন মুসলমান তার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চায় এবং তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করে দু'আ করে। এভাবেই আল্লাহর নাম ও তাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান-খেয়াল একজন মুসলমানের জীবনের গোটা সফরে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতিটি পদক্ষেপে অনুবর্তী থাকে।

এটাতো জীবনের একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মন্‌যিল। দৈনন্দিন জীবনেও আল্লাহ্‌র যিক্‌র অনুক্ষণ তার সঙ্গী থাকে। মুসলমান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে খাওয়া শেষ করে। যে সমস্ত লোক সুন্নতের ইহ্‌তিমাম করে থাকে, তাদের খানা-পিনা, কাপড় পাল্টানো, পায়খানায় যাওয়া-আসা সবই আল্লাহ্‌র নামে এবং তাঁরই ধ্যান-খেয়ালের সাথে হয়ে থাকে। হাঁচি এলেও তাকে আল্লাহ্‌র নাম নিতে বলা হয় এবং যিনি শুনবেন তাকে তার জন্য দু'আ করতে শেখানো হয়েছে। এছাড়া আরও যে সময় থাকল সে সময়গুলোও আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে মুক্ত নয়, মুক্ত নয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। মাশাআল্লাহ, ইন্‌শাআল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ কেবল তাঁর যিকরে মা'ছুরাই নয় বরং তার যবানের অংশে এবং সেসব দেশের দৈনন্দিন জীবনের বাগধারায় পরিণত হয়েছে যেখানে মুসলমানরা দীর্ঘকাল থেকে বসবাস করে আসছে এবং তাদের সভ্যতা প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

আর এসবই যিক্‌র ও তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার বাহানা মাত্র। কোন সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা, তার ভাষা, তার সাহিত্য ও তার দৈনন্দিন জীবন এভাবে আল্লাহ্‌র সত্তার দৃঢ় প্রত্যয় (ইয়াকীন) ও তাঁর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির (অর্থাৎ সর্বত্র ও সার্বক্ষণিকভাবে তিনি হাযির-নাজির) রঙে নিমজ্জিত-তেমনটি দেখা যাবে না। উপমহাদেশের মুসলমানদের সভ্যতার প্রথম আন্তর্জাতিক ও সম্মিলিত দিক হল এই ইয়াকীন তথা দৃঢ় প্রত্যয় ও তাঁর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির অনুভূতি যা তাদের জীবনের আলামত তথা প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : এর তৌহিদী আকীদা

মুসলিম সভ্যতার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আলামত তথা প্রতীক হল আকীদা-ই তৌহীদ যা আকীদা-বিশ্বাস থেকে নিয়ে আমল তথা কর্মের জগত এবং ইবাদত-বন্দেগী থেকে নিয়ে অনুষ্ঠানমালা পর্যন্ত সর্বত্র উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হবে। মুসলমানদের মসজিদগুলোর মীনার থেকে প্রতিদিন পাঁচ বার এই আকীদা-বিশ্বাসেরই ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ ইবাদত-বন্দেগী পাবার উপযুক্ত নয়, নয় কেউ এর অধিকারী। তাদের বসতবাটি বা বাসা-বাড়ি ও চিত্রশালাও ইসলামের মূলনীতি মুতাবিক মূর্তিপূজা ও শেরেকী প্রতীক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য ও মূর্তি তাদের জন্য নাজায়েয। এমনকি শিশুদের খেলাধুলার ক্ষেত্রেও এর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক অথবা রাষ্ট্রীয় আনন্দ উৎসবই হোক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্মদিনই হোক কিংবা ধর্মীয় নেতার জন্মদিন অথবা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ছবি ও প্রতিকৃতির সামনে মস্তক অবনত করা, তার সামনে করজোড়ে দাঁড়ানো কিংবা এতে পুষ্পমাল্য অর্পণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ এবং এগুলো তৌহিদী আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতার পরিপন্থী এবং মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক ইসলামী সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ও একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তারা অবশ্যই এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে থাকবে। নামের ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠানের বেলায়, শপথ গ্রহণে ও পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হেজাযী তৌহিদের সীমা অতিক্রম করা ও অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অনুকরণ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবারই নামান্তর।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা

ইসলামী সভ্যতার তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতীক চিহ্ন মানুষের মর্যাদা ও

শ্রেষ্ঠত্বের সেই ধারণা এবং মানবীয় সাম্যের সেই আকীদা ও বিশ্বাস যা মুসলমানদের প্রাথমিক খাদ্য হিসাবে তার মুখে ধরা হয় এবং যা তাদের ইসলামী মেযাজে পরিণত হয়েছে। এই আকীদা-বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি হল এই যে, মুসলিম মন-মানস স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ছুৎ-অচ্ছুৎ-এর আচার-আচরণ ও প্রথা থেকে একেবারে অজ্ঞ ও অপরিচিত। একজন মুসলমান নির্দ্বিধায় অপর মুসলমানের বরং যে কোন লোকের সঙ্গে বসে খাবার গ্রহণে তৈরি হয়ে যাবে এবং খাওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী যে কোন লোককে তার সাথে খানায় শরীক হবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। বিভিন্ন পেশার ও নানা জাতের কয়েকজন লোক একই পাত্রে ও একই থালায় বসে অসংকোচে খাবে। একে অপরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবে এবং পরস্পর পরস্পরের অবশিষ্ট পানি পান করবে। প্রজা ও রাজা একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়বে। ইমাম একজন সাধারণ মানের তথা যে কোন স্তরের লোকই হন না কেন যদি তিনি নামাযের ইমাম হন তবে সে অবস্থায় বড় বড় বংশের, অভিজাত খান্দানের লোক ও উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী শাসক ও প্রশাসক তার পেছনে নামায পড়তে বাধ্য।

ছোটখাটো ও খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য

এইসব নীতিগত ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইবরাহিমী সভ্যতার কিছু কিছু ছোট-খাটো ও খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একইরূপে দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাল কাজগুলো ডান হতে করা, ডান হাতে খাওয়া, ডান হাতে পান করা, কাউকে কিছু দিতে হলে ডান হাতে দেওয়া, তদ্রূপ গ্রহণের সময় ডান হাতে নেওয়া ইত্যাদি।

মুসলিম সমাজে পেশার অবস্থানগত মর্যাদা

মুসলিম সমাজে কোন পেশাই যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি কোন পেশাই ঘৃণ্য কিংবা অবজ্ঞেয় নয়। ইসলামে কোন পেশার কিংবা খেদমতেরই স্থায়ী ও চিরন্তন মর্যাদা নেই যে, তার আর পরিবর্তন হতে পারবে না। এর ভিত্তিতে না কোন কওম গঠিত হয়, না গঠিত হয় কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়। মানুষ তার প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার নিরিখে বিভিন্ন যুগে কোন-না-কোন পেশা গ্রহণ করেছে। কোন কোন সময় সে এর ভেতর সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং কোন কোন সময় কয়েক পুরুষ পর্যন্ত এই ধারা চলেছে। এখনও কোন কোন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভেতর একই ধরনের কাজ চলে। কিন্তু এর পেছনে ধর্মীয় কোন অবস্থানগত মর্যাদা নেই এবং এটা মুসলিম সমাজের অখণ্ড ও অলংঘনীয় কোন বিধানও নয়।

এসব গোষ্ঠী ও ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে যখনই যে কেউ চায় তার পেশা ও বৃত্তি পরিবর্তন করতে পারে, করেও। এতে কারুর কোন আপত্তি থাকে না। ইসলামে কোন পেশাকেই অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় না। ইসলামের কেন্দ্রভূমি (মক্কা, মদীনা) ও আরব দেশগুলোতে কয়েকজন জলীলূল কদর আলেম ও সম্মানিত মুসলমানের নামের সঙ্গে তাঁদের পেশাগত পদবী যুক্ত রয়েছে, যা তাঁদের কোন ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ কোন এককালে গ্রহণ করেছিলেন। একে তাঁরা লজ্জা ও অপমানের বলে মনে করেন না এবং এতে অপর কারুর চোখেও তাঁরা ছোট হয়ে যান না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, এখন যিনি মক্কা মু'আজ্জমায় অবস্থিত হারাম শরীফের (যার মধ্যে খানায়ে কা'বা শরীফ অবস্থিত) ইমাম ও খতীব, তাঁর নামের অংশ হিসাবেও এমনি ধরনের পদবী যুক্ত আছে। তেমনি আরও কয়েকজন আলেমের নামের শেষে পদবী হিসেবে হাল্লাক (নাপিত), যায়্যাত (কলু, তেলী), সাওয়াফ (ধুনরী), কাসসাব (কসাই, গোশ্ত বিক্রেতা) যুক্ত আছে। এতে অবজ্ঞা ও অপমানের কিছু আছে বলে মনে করা হয় না।

বিধবা বিবাহ

বিধবার পুনর্বিবাহকে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা মুসলমানদের প্রচলিত নিয়ম ও রেওয়াজের মধ্যে কখনো দূষণীয় ও আপত্তিযোগ্য কাজ বলে মনে করা হয়নি। এটা তো তাদের নবীর সুন্নত এবং প্রত্যেক যুগে জলীলুল কদর আলেম-উলামা, মর্যাদাবান রাজা-বাদশাহ্ বিনা দ্বিধায় ও অসংকোচে বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করেছেন, করতেন এবং নিজেদের বিধবা বোন ও কন্যাদেরকে পুনরায় বিবাহ্ দিতেন। এখন যদিও অনেক বিধবা নিজস্ব অভিপ্রায় কিংবা কোনরূপ মজবুরীর দরুন দ্বিতীয় বিয়ে ছাড়াই জীবন কাটান, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে করাই উত্তম এবং হওয়া দরকার। অনেক দেশে এখনও এ রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায় এবং বিধবা বিবাহকে আদৌ দূষণীয় মনে করা হয় না।

সালামের রেওয়াজ এবং এর বিভিন্ন তরীকা

দেখা-সাক্ষাৎ ও আসা-যাওয়ার মধ্যে সালামের রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত। এটা মুসলমানদের আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসম্প্রদায় সালাম। সালামকারী মুসলিম ভাই-এর সঙ্গে দেখা হতেই 'আস্সালামু আলায়কুম' বলে যার অর্থ হল, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। এর জওয়াব হল, 'ওয়া আলায়কুমু'স্-সালাম' অর্থাৎ তোমার ওপরও সালাম তথা শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলামে 'ইল্‌ম (জ্ঞান)-এর স্থান ও মর্যাদা

১২ই ফেব্রুয়ারী, ৬১১ খৃ. -এর কাছাকাছি আরবের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বত গুহায় সর্বপ্রথম যে ওয়াহী নাযিল হয় তার শব্দসমষ্টি ছিল নিম্নরূপ ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

"পড়ুন আপনার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে সেঁটে থাকা বস্তু থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভু-প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।" সূরা আলাক ঃ ১-৫

বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁর অবতীর্ণ ওয়াহীর এই প্রথম কিস্তিতে এবং করুণা-নিঃসৃত বৃষ্টিধারার এই প্রথম ছিঁটাতেও এই সত্য ঘোষণাকে বিলম্বিত ও মুলতবী করেন নি যে, ইল্‌ম-এর ভাগ্য কলমের সঙ্গে জড়িত। হেরা গুহার এই নির্জনতায় যেখানে একজন উম্মী নবী আল্লাহ্‌র থেকে দুনিয়াবাসীর পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত পয়গাম আনতে গিয়েছিলেন এবং যাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তিনি নিজে কলম চালাতে শেখেননি এবং কলমী বিদ্যা সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না। দুনিয়ার ইতিহাসে কি এর দ্বিতীয় কোন নজীর মিলবে? এবং এই সমুন্নতির কল্পনাও করা যাবে কি যে, এই নিরক্ষর নবীর ওপর, একটি অক্ষর জ্ঞানহীন উম্মাহ্‌র ওপর এবং লেখাপড়া সম্পর্কে অজ্ঞ একটি দেশের মাঝে (যেখানে কলেজ-ভার্সিটি তো বহু দূরের কথা, অক্ষর জ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটুকুও যেখানে ছিল না) প্রথমবারের মতো ওয়াহী নাযিল হচ্ছে, আসমান ও যমীনের মধ্যে কয়েক শতাব্দী পর যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে যার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে...... اِقْرَأْ অর্থাৎ পড়ুন শব্দের মাধ্যমে। যিনি নিজেই ছিলেন অক্ষর জ্ঞান-শূন্য, তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। এর ভেতর তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, পড়ুন। এর মধ্যে সেদিকেও ইঙ্গিত ছিল যে, আপনাকে যেই উম্মাহ দেওয়া হচ্ছে সেই উম্মাহ্ কেবল বিদ্যার্থীই হবে না, ইল্‌ম অন্বেষণকারীই হবে না বরং শিক্ষক হবে, জ্ঞানী হবে, হবে জ্ঞানের ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। তারা বিশ্বে জ্ঞানের প্রচারক হবে না। যে যুগ তাঁর অংশে পড়েছে সেই যুগ নিরক্ষরতার যুগ হবে। সেই যুগ ভয়-ভীতি ও বন্য প্রকৃতির হবে না, সেই যুগ মূর্খতার যুগ হবে না, সেই যুগ জ্ঞানের প্রতি দুশমনীর যুগ হবে না। সেই যুগ হবে জ্ঞানের যুগ, বুদ্ধির যুগ, দর্শন বিজ্ঞানের যুগ, নির্মাণের যুগ, মানব প্রেমের যুগ, সেই যুগ হবে উন্নতি ও প্রগতির যুগ।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'সেই প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। এই যুগে বড় রকমের ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছিল আর সেই ভ্রান্তি ছিল এই যে, স্রষ্টার সঙ্গে, প্রভু-প্রতিপালকের সঙ্গে 'ইলম-এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য ইল্ম সোজা সরল পথ থেকে সরে গিয়েছিল। সেই ছিন্ন সম্পর্ককে এখানে জোড়া হয়েছে। যখন ইল্ম-এর কথা স্মরণ করা হল, তাকে সম্মানিত করা হল, এর সাথে সাথে এও অবহিত করা হল যে, এই ইল্ম-এর সূচনা-"রব" তথা প্রভু-প্রতিপালকের নামে হতে হবে। এজন্য যে, 'ইল্ম তথা জ্ঞান তাঁরই প্রদত্ত, তাঁরই দেওয়া, তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই পথ-নির্দেশনায় এই ইল্ম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি করতে পারে। এটা ছিল পৃথিবীর সবচে' বড় বিপ্লবাত্মক ও বজ্র নির্ঘোষ বাণী যা আমাদের পার্থিব এই কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। যদি পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আহবান জানানো হয় যে, আপনারা অনুমান করুন, কল্পনায় আনুন যে, যেই ওয়াহী নাযিল হতে যাচ্ছে, যেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে চলেছে তার প্রারম্ভ ও সূচনা হবে কিসের দ্বারা, কি দিয়ে ? এতে কোন্ জিনিসের প্রাধান্য দেওয়া হবে? জোর দেওয়া হবে কিসের ওপর? তাহলে আমি মনে করি যে, তাদের ভেতর একজনও যিনি এই নিরক্ষর জাতিগোষ্ঠী, তাদের মেযাজ ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে অবহিত- বলতে পারতেন না যে, অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ "ইকরা" অর্থাৎ পড়ুন শব্দ দিয়ে শুরু হবে।

এটা ছিল এক বিপ্লবাত্মক আহ্বান যে, 'ইল্ম-এর যাত্রা পরম বিজ্ঞ ও জ্ঞানী মহাপ্রভুর পথ-নির্দেশনাধীনে শুরু করা উচিত। কেননা এ সফর বড় দীর্ঘ, বেশ জটিল, বিপদসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ পথে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়। পদে পদে ভীতিপূর্ণ ও গভীর খানা-খন্দকে ভরপুর। নদী-নালাও কম নয়। প্রতি পদক্ষেপে সাপ-বিচ্ছুর ভয়। এজন্য এ পথে একজন অভিজ্ঞ ও কামেল "রাহবার" তথা পথ-প্রদর্শক প্রয়োজন, যাঁর সাহচর্যে এই ভীতিকর ও বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করা যায়। আর সেই "রাহবার" হলেন প্রকৃতপক্ষে সেই মহিমময় পরম সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-'আলামীন'॥ এককভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য নয়। সেই ইল্ম আমাদের কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত নয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয় যা কেবল লতাগুল্ম ও কাপড়ের ওপর বুনট করা ফুলপাতা তৈরির নাম, যা কেবল খেলনার সাহায্যে ক্রীড়া- কৌতুকের নাম। সেই ইল্ম নয় যা কেবল চিত্ত বিনোদনের নাম, সেই জ্ঞান নয় যা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম। সেই জ্ঞান নয় যা কেবল এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে কী করে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হবে তা শেখায়। সেই ইল্মও নয় যা কেবল কী করে উদর পূর্তি করতে হয় তাই শেখায়। সেই ইল্ম ইল্ম নয় যা কেবল যবান ইস্তেমাল করতে শেখায়,

কেবল ভাষার ব্যবহার শেখায় বরং শেখায়

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

"পড়ুন,আপনার প্রভু-প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে", শেখায় 'আপনার প্রভু-প্রতিপালক বড় মহান'। যিনি মহান-তিনি তোমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে, তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে কী করে অজ্ঞ ও অপরিচিত থাকতে পারেন।" "যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।" আপনি লক্ষ্য করুন যে, কলমের মর্যাদা, লেখনীর সম্মান এর চেয়ে বেশি আর কে বাড়িয়েছেন যে, হেরা গুহায় অবতীর্ণ প্রথম ওয়াহীও কলমের কথা বিস্মৃত হয়নি, ভোলেনি। সেই কলম যা বহু খোঁজাখুজি করলেও সম্ভবত কোন ঘরে পাওয়া যেত না তখন। আপনি যদি কলমের খোঁজে বের হতেন, তবে জানি না, হয়তো কোন ওয়ারাকা ইবনে নওফল কিংবা কোন "কাতেব" (আরবে লেখাপড়া জানা লোকদেরকে কাতেব বলা হত) -যিনি আরব বহির্ভূত কোন দেশ থেকে কিছু লেখাপড়া শিখে এসেছেন-এর ঘরে পেতেন।

এরপর আরও একটি বিরাট বড় বিপ্লবাত্মক ও অবিনশ্বর সত্য বিবৃত করেছেন যে, ইল্‌ম-এর কোন সীমা-সরহদ নেই। عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে এর পূর্বে জানত না, যে সম্পর্কে আগে তার কোন জ্ঞান ছিল না।" বিজ্ঞান কী? প্রযুক্তি কী? মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। মহাশূন্য আমরা পাড়ি দিয়েছি। পৃথিবীর রশি ধরে আমরা টান দিয়েছি। এসব .... এর ক্যারিশমা নয় তো আর কি?

শিল্পকলা সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

এই সভ্যতার (অর্থাৎ ইবরাহিমী ও মুহাম্মদী সভ্যতা তথা মুসলিম সভ্যতার) একটি বৈশিষ্ট্য হল এর গুরু-গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা, বাস্তববাদিতা এবং শিল্প-কলা সম্পর্কে সতর্ক ও ভারসাম্যময় দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে মূল্য দেয়। কিন্তু যে সব ক্রীড়া-কৌতুক ও বিনোদনমূলক শিল্পকে যূরোপ শিল্পকলা তথা ফাইন আর্টস নাম দেয় তার কতক শাখাকে সে নাজায়েয আখ্যা দেয়। যেমন নৃত্য ও চিত্রকলা, (জীবন্ত প্রাণীর) মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। যেমন বিশেষ বিশেষ শর্তাধীনে ভারসাম্য রক্ষা করে সঙ্গীত থেকে উপকৃত হওয়া ও শ্রবণ করা অনুমোদিত। এই সব সূক্ষ্ম শিল্প-কলার মধ্যে গভীর নিবিষ্টতা ও নিমগ্নতা মোটের ওপর মুসলিম সভ্যতার রূহ ও এর লক্ষ্যের বিরোধী এবং আল্লাহ্‌ভীতি, পরকালীন চিন্তা ও এর নৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ডের জন্য ক্ষতিকর যা একজন মুসলমানের কাছে প্রত্যাশিত।

ধর্ম জীবনের তত্ত্বাবধায়ক

যুগ-যমানা পরিবর্তন ও অপরিবর্তনশীলতার সমান্তরাল ও সমষ্টির নাম। কাল প্রবাহের মধ্যে উজান যেমন আছে, তেমনি আছে ভাটিও। যুগ-যমানা তথা কালপ্রবাহ যদি এই দু'টো বৈশিষ্ট্যের কোন একটি হারিয়ে বসে কিংবা এই দুই যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কোন একটি খুইয়ে ফেলে তাহলে সে তার উপযোগিতাকেই হারিয়ে বসবে।

ঠিক তেমনি সৃষ্টি জগতে যত কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, যত ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সত্তা রয়েছেন সবার ভেতর পজিটিভ ও নিগেটিভ স্রোত চিরাচরিত নিয়মেই কাজ করে থাকে। এই দুই স্রোত-প্রবাহ মিলিত হলেও কেবল সেই অপরিহার্য দায়িত্ব পালিত হয় ও সেই কর্তব্য পূরণ হয় যা তাকে সোপর্দ করা হয়েছে।

যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নেয়া এবং তার সাথী হওয়া এটা কোন থার্মোমিটারের সংজ্ঞা হতে পারে, কিন্তু ধর্মের নয়। থার্মোমিটারের কাজই হল উত্তাপের মাত্রা কিংবা ঠাণ্ডার মাত্রা কতটা বা কি পরিমাণ- তা বলা। এটা আবহাওয়া ঘড়ির (Weather Clock) সংজ্ঞা হতে পারে যা কোন বিমান বন্দর কিংবা সুউচ্চ অট্টালিকার ওপর স্থাপন করা হয়। এটা স্থাপন করা হয় কেবল এটুকু জানার জন্য যে, বাতাসের গতিপ্রবাহ কোন্ দিকে। কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা তা হতে পারে না। আমি মনে করি যে, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি ধর্মকে তার সুউচ্চ ও সমুন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে থার্মোমিটার কিংবা আবহাওয়া ঘড়ির অবস্থানে নিয়ে আসতে চাইবেন। আপনারা কখনো এটা চাইবেন না যে, কেবল যুগের পরিবর্তনের সার্টিফিকেট প্রদান করাই ধর্মের কাজ হোক কিংবা ধর্ম পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিতে থাকবে অথবা তার ছায়া হিসেবে বিরাজ করবে। বিশুদ্ধ আসমানী ধর্ম তো দূরের কথা, কোন নাম সর্বস্ব ধর্মের অনুসারী কিংবা প্রতিনিধিও ধর্মের এই অবস্থান মেনে নেবার জন্য রাজী হবেন না।

ধর্ম পরিবর্তনকে এক বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নেয় এবং এর জন্য সে যাবতীয় অবকাশ রাখে যা একটি সৎ, সহীহ-শুদ্ধ, স্বাভাবিক ও বৈধ পরিবর্তনের জন্য জরুরী বিবেচিত হয়। ধর্ম হয় জীবনের সঙ্গী। কিন্তু কেবল সঙ্গ দেওয়া কিংবা শুধুই সাহচর্য ও আনুগত্য নয় বরং এর সাথে সাথে ধর্মের দায়িত্ব এও যে, সে পার্থক্য করবে কোনটি সুস্থ পরিবর্তন আর কোনটি অসুস্থ, এটা ধ্বংসাত্মক আর এটা গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল। এর পরিণাম মানবতার অনুকূলে কিংবা নিদেনপক্ষে এই ধর্মের অনুসারীদের পক্ষে কি হবে? ধর্ম যেখানে চলমান জীবনের

সাথী সেখানে সে জীবনের হিসাবও নেয়, তত্ত্বাবধানও করে। সে জীবনের শিক্ষক যেমন তেমনি অভিভাবকও।

অভিভাবকের কাজ এটা নয় যে, যেই ব্যক্তিটি তার অধীনে বা অভিভাবকত্বাধীনে আছে সে তার ভাল-মন্দ,-সুস্থ অসুস্থ ও শুদ্ধ-অশুদ্ধ পদক্ষেপকে সমর্থন যোগাবে, তার সহযোগী হবে। ধর্ম এমন কোন সিস্টেম নয় যে, যেখানে একই ধরনের হাতও আছে, অতঃপর যেই দলীল কিংবা দস্তাবীযই আসুক না কেন, ধর্ম তার ওপর সিলমোহর মেরে দেবে। না, ধর্মের কাজ তা নয়।

ধর্ম প্রথমে বিষয়টি পর্যালোচনা করবে, এরপর সে তার সিদ্ধান্ত পেশ করবে এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। কোন কোন সময় বাধ্য করে, ভয় দেখিয়ে তাকে এথেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবে। আর কোন ভুল দলীল কিংবা দস্তাবেয যদি তার সামনে আসে যে ব্যাপারে সে একমত নয় কিংবা যেটাকে সে মানবতার পক্ষে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর মনে করে তখন কেবল এই নয় যে, এর ওপর সিলমোহর মারতে অস্বীকার করবে বরং সে এর প্রতিবন্ধক হবে।

এখানেই নৈতিকতাবোধ ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ধর্ম ভুল প্রবণতাকে বাধা দেওয়াকে আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান করে। একজন নীতি-নৈতিকতা বিশেষজ্ঞ ও মনস্তত্ত্ববিদের দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, ভুল প্রবণতা চিহ্নিত করবে কিংবা এ ব্যাপারে সে তার দৃষ্টিকোণ তুলে ধরবে। পক্ষান্তরে ধর্ম এর পথ রোধ করে দাঁড়াবার প্রয়াস চালাবে।[১]

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে লেখকের "সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব ও এর অবদান" নামক গ্রন্থটি পাঠ করুন।

নৈতিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং আত্মশুদ্ধি

মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রাথমিক ও মৌলিক উদ্দেশ্য এবং মহান ও বুনিয়াদী উপকারিতা কুরআন পাকের অনেকগুলো আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ـ

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রসূল পাঠিয়েছি যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়"(আল-বাকারা ঃ ১৫১)।

নবী করীম (সা)-এর দাওয়াত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও আত্মশুদ্ধি বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় আসীন এবং কুরআনের বর্ণনা রীতি আমাদেরকে বলে দেয় যে, হিকমতের দ্বারা সমুন্নত চরিত্র ও ইসলামী আদব-আখলাক্কেই বোঝানো হয়েছে। কুরআনুল-করীম সূরা ইসরা (সূরা বনী-ইসরাঈল) এই সব আখলাক-চরিত্র ও আদবের মূলনীতি ও বুনিয়াদী বিষয়গুলো উল্লেখ করার পর সাধারণভাবে ওইগুলোকে "হিকমত" নামে স্মরণ করেছে। বলা হচ্ছে ঃ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

" তোমার 'রব' (প্রতিপালক) ওয়াহী'র দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করেছেন।" বনী ইসরাঈল ঃ৩৯;

স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে তা অত্যন্ত জোরের সাথে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"আর আমাকে পাঠানোই হয়েছে এজন্য যেন আমি আখলাক-চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দান করি" এবং তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের সর্বোত্তম নমূনা ও পরিপূর্ণ আদর্শ। কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

و انك لعلى خلق عظيم

"নিশ্চিতই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"। সূরা কলম, ৪ আয়াত।

হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কে নবী করীম (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ كان خلقه القران
'আল-কুরআনই হচ্ছে তাঁর চরিত্র' অর্থাৎ কুরআনুল-কুরীমের বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা ছিলেন তিনি। অতএব তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করতে হবে।

এই হিকমত ও আত্মশুদ্ধি ছিল আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সাহচর্য ও সান্নিধ্যের ফল। তাঁর প্রশিক্ষণধীনে ও স্নেহচ্ছায়ায় এমন একটি প্রজন্ম লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয় যাঁরা ছিলেন চরিত্র ও সর্বোত্তম গুণাবলী দ্বারা মণ্ডিত এবং মন্দ চরিত্র ও খারাপ আচার-অভ্যাস, নিন্দিত ও দূষণীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রবৃত্তির শয়তানী চক্রান্ত, জাহিলিয়াতের চিহ্ন এবং শয়তানের ধোকা ও ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ।

নবী করীম (সা) স্বয়ং নিজেও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। خير الناس قرنى

"আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম লোক।" বুখারী;

সম্মানিত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) অত্যন্ত অলংকারিক ভাষায় সাহাবীদের জামাতের পরিচয় পেশ করেছেন। খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক এ অর্থপূর্ণ ভাষায় তিনি স্বীকার করেছেন যে,

ابر الناس قلوبا و اعمقهم علما و اقلهم تكلفا

অর্থাৎ "সাহাবারা ছিলেন পাক-সাফ দিল্ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং কৃত্রিমতামুক্ত মনের মানুষ।"

তাঁরা ছিলেন ইসলামের বসন্ত মৌসুম এবং নবুওতের মানুষ গড়ার নমুনা, ছিলেন নবী করীমের কুশলী প্রশিক্ষণ ও শুদ্ধতার বিস্ময়কর নির্দশন।

মানুষ গড়ার স্থায়ী কারখানা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের ধারাবাহিকতা যখন ছিন্ন হয়ে গেল এবং তিনি যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তখন কুরআন পাক, হাদীস শরীফ ও তাঁর পবিত্র জীবনীচরিত এই শূন্যতা পূরণ করতে থাকল। ফিক্‌হে বাতেন ও হিকমত ছিল অন্তরের রোগ-ব্যাধি, প্রবৃত্তির শয়তানী ও শয়তানের চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচার এক চিরন্তন ও বিশ্বজয়ী চিকিৎসা ও হাসপাতাল।

কিন্তু নানা রাজনৈতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকারণের প্রভাবে ও কালের প্রবাহের ফলে হাদীসের প্রশিক্ষণমূলক ও নৈতিক দিক এবং এর মৌলিক চিন্তাধারা, বোধ ও উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পাঠদানের ওপর সেই সব পদ্ধতি চেপে বসতে থাকে যা সেই সময়কার সমাজের জন্য অধিক আকর্ষণীয়, মানুষের দৃষ্টিতে মর্যাদাদানকারী এবং নানা পদে অধিষ্ঠিত দিক ও সে সবের জন্য দলীল-প্রমাণ সরবরাহ করা এবং সীরাত তথা জীবনচরিত ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও হাদীস ও সীরাত (কুরআন মজীদের পর) নৈতিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, আত্মশুদ্ধি, অন্তরের মরিচা পরিষ্কারকরণ এবং মানবীয় আত্মার দর্পণকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার সবচে' কার্যকর ও সহজতম উপায় বা মাধ্যম।

হাদীসের কিতাবগুলোয় যে সব উপকরণ পাওয়া যায় তা দু'ধরনের : একটির সম্পর্ক আমল, তার আকার-আকৃতি, অনুভূত হুকুম-আহকাম, যেমন সালাতের কিয়াম (নামাযে দাঁড়ানো), বৈঠক, রুকূ, সিজদা, তেলাওয়াত ও তসবীহ, দো'আ-দরূদ, যিক্‌র-আযকার, ওজীফা, দাওয়াত ও তাবলীগ, যুদ্ধ-জিহাদ, যুদ্ধকালে ও সন্ধি বা সমঝোতা স্থাপনের সময় শত্রু-মিত্রের সঙ্গে ব্যবহার, অপরাপর বিধি-বিধান (হুকুম-আহকাম) ও মসলা-মাসায়েলের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় প্রকার সেই সব বাতেনী তথা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রকাশ্য অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলো উল্লিখিত আমল আদায়ের সঙ্গে পাওয়া যায় এবং যে গুলো ঐসব আহকাম তথা বিধানাবলীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ওই সব অবস্থান ব্যাখ্যা আমরা ইখলাস ও ইহতিসাব (নিষ্ঠা ও একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় আমল করা), ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা, যুহ্‌দ ও ইস্তিগনা (পার্থিব সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি ও উপেক্ষা), নিজের স্বার্থের মুকাবিলায় অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান, বদান্যতা, শিষ্টাচার ও লজ্জাশীলতা, বিনয় ও নম্রতা, আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাওয়া, ইহলৌকিক জীবনের মুকাবিলায় পারলৌকিক জীবনকে প্রাধান্য দান, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর সাক্ষাতের তীব্র আগ্রহ, স্বভাবের ভারসাম্য, সুরুচি, সৃষ্ট জীবের ওপর দয়ামায়া ও স্নেহ, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, আবেগের পবিত্রতা, দয়া ও বদান্যতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা ও সৌজন্য, বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা ও তাঁরই জন্য ঘৃণা, সদয় ও উত্তম আচরণ, অভিজাত ও মানবতার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরো এবং নাযুক থেকে নাযুকতরো আকার-আকৃতি, মন্দ আচরণকারীর সঙ্গেও উদার ও ক্ষমাসুলভ ব্যবহার, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মীয়তা রক্ষা, হস্ত সংবরণ ও সংকোচনকারীর প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ এবং এই জাতীয় আরও বহুবিধ অবস্থা

আছে যা দৃষ্টান্ত ও নমুনা ব্যতিরেকে উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না এবং দিব্য চক্ষে দর্শন, পর্যবেক্ষণ ও বহুসংখ্যক লোকের সাক্ষ্য ছাড়া যা বিশ্বাস করাও কঠিন-এর দ্বারা করতে পারি।

এজন্যই আমরা এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক মহোত্তম গুণাবলী উল্লেখ করছি যেগুলো তাঁরাই বর্ণনা করেছেন যাঁরা তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন এবং যাঁরা তাঁকে নির্জনে ও প্রকাশ্য সমাবেশে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন, যাঁদের দৃষ্টি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর খুবই গভীর ছিল। এরপর আমরা খুবই সংক্ষেপে তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী বর্ণনা করব এবং এও বর্ণনা করব তিনি দেখতেই বা কেমন ছিলেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সামগ্রিক গুণাবলী

নিচে আমরা কেবল দুটো সাক্ষ্য তুলে ধরাকেই যথেষ্ট মনে করব। তন্মধ্যে একটি হল হিন্দ ইবনে আবী হালার [উম্মু'ল-মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান এবং হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর মামা] সাক্ষ্য আর অপরটি হল হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা)-এর সাক্ষ্য যা তাঁরা আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে দিয়েছেন।

"রসূলুল্লাহ (সা) সব সময় আখেরাতের চিন্তায় ও পারলৌকিক বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন। এক্ষেত্রে তাঁর একটি ধারাবাহিকতা ছিল। এ চিন্তা তাঁকে সব সময় অস্থির করে রাখত। অধিকাংশ সময় তিনি দীর্ঘ নীরবতা পালন করতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলতে শুরু করলে কথাগুলো বেশ ভালভাবে উচ্চারণ করতেন এবং সেভাবেই শেষ করতেন। তাঁর আলোচনা ও বর্ণনা খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থতামুক্ত হত। কথা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ যেমন হত না, তেমনি তা খুব সংক্ষিপ্তও হত না (বরং পরিমিত হত)। তিনি নরম মেযাজের ও নম্রভাষী ছিলেন, কর্কশ ও রূঢ়ভাষী ছিলেন না। তিনি কাউকে যেমন ঘৃণা কিংবা অবজ্ঞা করতেন না, তেমনি কেউ তাঁকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করুক তাও পছন্দ করতেন না অর্থাৎ তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না যে, সব কিছুই মেনে নেবেন বরং প্রভাবমণ্ডিত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নে'মতের বিরাট কদর করতেন এবং খুব বেশি করতেন, চাই পরিমাণে যতই স্বল্প হোক না কেন, এমন কি তা চোখে না পড়ার মত বিষয়ও যদি হয় এবং এর ত্রুটি বা খুঁৎ ধরতেন না। খানাপিনার বস্তুর দোষ ধরতেন না যেমন, তেমনি প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব ও পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ওপর ক্রোধান্বিত হতেন না। কিন্তু

আল্লাহ্‌র কোন হক নষ্ট হতে দেখলে সে সময় তাঁর জালাল তথা তেজস্বিতার সামনে কোন কিছুই তিষ্ঠাতে পারত না যতক্ষণ না তিনি তার বদলা নিতেন। তিনি নিজের ব্যাপারে কখনও ক্রুদ্ধ হননি এবং কারো থেকে কখনও প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। ইশারা করতে হলে গোটা হাত কাজে লাগাতেন। কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে একে উল্টে দিতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুকে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে মেলাতেন। রাগের কিংবা অপসন্দনীয় কথা হলে শ্রোতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। খুশী হলে চোখ নামিয়ে ফেলতেন। তাঁর হাসি বেশির ভাগ সময় মুচকি হত যার ফলে বৃষ্টিস্নাত মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দেবার মত তাঁর মুক্তার মত উজ্জ্বল দাঁতগুলো দেখা যেত।"

হযরত আলী (রা) ছিলেন তাঁর খান্দানেরই লোক। তিনি লেখাপড়ার ও জানাশোনার ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিলেন এবং যাঁর দৃষ্টি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর গভীরে প্রবেশ করেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত নিকটজন ও কাছের মানুষ, এরই সাথে মানুষের গুণাবলী প্রকাশে ও দৃশ্য বর্ণনায় যিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম। তাঁর "মহান চরিত্র" ..... সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"তিনি প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ কথা বলা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে অবস্থান করতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেও এমন কোন বিষয় তাঁর থেকে প্রকাশ পেত না। বাজারে তিনি কখনো উচ্চ স্বরে কথা বলেন নি। মন্দের বদলা কখনো মন্দের দ্বারা নিতেন না, বরং ক্ষমা করতেন। তিনি কখনো কারো ওপর হাত তোলেন নি একমাত্র জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া। কখনো কোন খাদেম কিংবা মহিলার ওপর হাত ওঠাননি। কোন প্রকার জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে কেউ কখনো দেখেনি যতক্ষণ না কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হুদূদ বা সীমারেখা অতিক্রম করত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঁচ পড়ত। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুম নষ্ট করা হলে এবং তাঁর মর্যাদার ওপর আঘাত এলে তিনি এর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত হতেন। দু'টো জিনিস সামনে এলে সহজতরটিকে নির্বাচিত করতেন। যখন নিজের ঘরে তশরীফ নিতেন তখন সাধারণ মানুষের মতই দৃষ্টিগোচর হতেন। নিজেই কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সকল প্রয়োজন নিজেই আঞ্জাম দিতেন।

"নিজের যবান হেফাজত করতেন। কেবল তখনই মুখ খুলতেন যখন এর প্রয়োজন দেখা দিত। লোকের মন জয় করতেন, তাদের মনকে ঘৃণাসিক্ত করতেন না। কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিগোষ্ঠীর সম্মানিত লোকের আগমন

ঘটলে তিনি তার সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদামণ্ডিত আচরণ করতেন এবং তাকে ভাল ও উচ্চ পদে নিযুক্ত করতেন। লোকের সম্পর্কে সতর্ক ও মাপা মন্তব্য করতেন আপন হৃদ্যতা ও আখলাক দ্বারা মাহরূম না করেই। আপন সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। লোকদের থেকে বিভিন্ন লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

"ভাল কথার ভাল দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতেন এবং একে শক্তি যোগাতেন। মন্দ কথার অনিষ্টকর দিক বলে দিতেন এবং একে দুর্বল করে দিতেন। তাঁর ব্যাপারগুলো ছিল ভারসাম্যময় ও একই রূপ। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হত না। কোন কিছুর প্রতি অলসতা কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করতেন না এই ভয়ে যে, না জানি অন্যেরাও এই অলসতার শিকার হয় এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই তাঁর নিকট সেই অবস্থা মাফিক প্রয়োজনীয় সামান ছিল। সত্যের ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্যের প্রশ্রয় দিতেন না, আবার সীমা অতিক্রমও করতেন না। যেসব লোক তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তাঁরা হতেন সবচেয়ে ভাল ও নির্বাচিত লোক। তাঁর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম লোক তিনি ছিলেন যিনি সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং যার ব্যবহার ভাল। তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি যিনি মানুষের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারী, সহানুভূতিশীল এবং যিনি অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় সকলের আগে থাকেন। আল্লাহ্র যিক্র করতে করতে দাঁড়াতেন এবং আল্লাহ্র যিক্র করতে করতে বসতেন। কোথাও তশরীফ নিলে যেখানে মজলিস সমাপ্ত হত সেখানেই তশরীফ রাখতেন এবং এ জন্য আদেশও করতেন। মজলিসে উপস্থিত লোকদের ও সাথীদের সবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতেন এবং সকলের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। উপস্থিত সকলেই মনে করতেন যে, হযরত (সা)-এর চোখে তাঁর চেয়ে বেশি আপন বুঝি আর কেউ নন। যদি কেউ কোন বিশেষ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যে রসূল (সা)-কে বসাতেন কিংবা কোন প্রয়োজনে কথা বলতেন তবে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে তাঁর সকল কথা শুনতেন যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করে নিজে থেকেই বিদায় নিত। যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইত, সাহায্য কামনা করত, তবে তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। কিছু দিতে না পারলে কমপক্ষে তাকে মিষ্টি ও কোমল ভাষায় জওয়াব দিতেন। তাঁর উত্তম ব্যবহার সবার জন্যই উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি তাদের জন্য পিতার ভূমিকা পালন করতেন। সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের লোক সত্যের মাপকাঠিতে তাঁর দৃষ্টিতে সমান ছিল। তাঁর মজলিস ইল্ম ও মা'রিফাত, লজ্জা-শরম, ধৈর্য ও আমানতদারীর মজলিস ছিল। এ মজলিসে কেউ উচ্চ কণ্ঠে কথা বলত না; কারও দোষ-ত্রুটির চর্চা কিংবা চরিত্র হননও

করা হত না এ মজলিসে। কারুণ সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানা হত না কিংবা কারোর চারিত্রিক দুর্বলতাকে ঢোল পিটিয়ে প্রচারও করা হতো না। সকলেই ছিল সমান। কারো ওপর কারোর মর্যাদা থাকলে তা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই ছিল। ছোটরা বড়দের সম্মান করত আর বড়রা ছোটদের করতেন স্নেহ ও মায়া। অভাবী ও দুঃস্থ লোকদেরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন, মুসাফির ও নবাগতকে হেফাজত করতেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন।"

হযরত আলী (রা) আরও বলেন ঃ

"তিনি সব সময় হাসিখুশী ও প্রফুল্ল থাকতেন। তিনি ছিলেন কোমল চরিত্রের ও নরম দিলের মানুষ। তিনি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। রূঢ় ও কঠোর ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। মানুষের ওপর খুব সত্বর সদয় হয়ে যেতেন, খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন। কারও সঙ্গে ঝগড়া করতেন না, বরং পরিপূর্ণ ভাব-গম্ভীর, শান্ত ও ধীরস্থির মেযাজের ছিলেন তিনি। চেঁচিয়ে কথা বলতেন না, সাধারণত ফালতু কথা বলতেন না আর নিম্নমানের কথাও বলতেন না। কারও ওপর দোষ চাপাতেন না। সংকীর্ণ চিত্ত ও কৃপণ ছিলেন না। যে কথা তাঁর পছন্দ হত না তা তিনি উপেক্ষা করতেন, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। স্পষ্টভাবে সে সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করতেন না এবং এর জওয়াবও দিতেন না। তিনটি জিনিসের স্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে চলতেন ঃ (১) ঝগড়া, (২) অহংকার ও (৩) অনর্থক কথা ও কাজ। লোকদেরকেও তিনটি জিনিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ঃ (১) কারো ওপর দোষ চাপাতেন না, (২) কারো দুর্বল ও গোপনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করে বেড়াতেন না এবং (৩) কেবল সেই কথাই বলতেন-যে কথাতে ছওয়াবের আশা করা যেত। যখন কথা বলতেন মজলিসে উপস্থিত লোকেরা সম্মানার্থে এমনভাবে মস্তক অবনত করে ফেলত যে, মনে হত বুঝিবা সকলের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, না জানি নড়াচড়াতে তা উড়ে যায়। যখন তিনি চুপ করতেন তখন তারা কথা বলত। তাঁর সামনে তারা কখনো ঝগড়ায় লিপ্ত হত না। যদি তাঁর মজলিসে কেউ কথা বলত তখন আর সব লোক চুপ করে কথকের কথা শুনত যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করত। রসূল (সা)-এর সামনে প্রত্যেক লোকের কথা বলার অধিকার ঠিক ততটুকুই থাকত যতটুকু থাকত তার পূর্ববর্তী লোকের যাতে সে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে কথা বলার সুযোগ পায় এবং ঠিক তেমনি সম্মান ও প্রশান্তির সঙ্গে তা শোনা হত। যে কথায় সকলে হাসত, তিনিও তাতে হাসতেন। যে কথায় লোকে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনিও তাতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

মুসাফির ও পরদেশীর বেআদবী সইতেন ও সর্বপ্রকার যাচঞা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ ধরনের লোকদের মনোযোগ নিজেদের দিকে টেনে নিতেন যাতে রসূল (সা)-এর ওপর তা বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি বলতেন ঃ তোমরা অভাবী ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী লোক পেলে তাদের সাহায্য করবে। তিনি সেইসব লোকের প্রশংসা ও স্তুতি কবুল করতেন যারা সীমার ভেতর অবস্থান করত। কারো কথা বলার সময় কথা বলতেন না, তার কথা মাঝপথে থামিয়েও দিতেন না। তবে হ্যাঁ, সীমা অতিক্রম করলে তাকে নিষেধ করতেন এবং মজলিস থেকে উঠে গিয়ে তার কথা থামিয়ে দিতেন।

"তিনি ছিলেন সবচেয়ে উদার মন ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সামাজিক পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে বদান্য ছিলেন। যে তাঁকে প্রথম দেখত সে-ই ভীত ও কম্পিত হয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে থাকলে এবং জানাশোনা হলে মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও অভিভূত হত এবং যেই তাঁকে দেখত সে-ই বলত যে, তাঁর মত আর কাউকে এর আগে যেমন দেখিনি, তেমনি দেখিনি তাঁর পর অন্য কাউকে। আমাদের নবী করীম (সা)-এর ওপর আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহরাশি বর্ষিত হোক।"

এক নজরে রসূল আকরাম (সা)-এর উন্নত চরিত্র

লোকের ভেতর তিনিই সবচেয়ে উদার হৃদয় বিশিষ্ট, কোমল প্রকৃতির এবং খান্দানের দিক দিয়ে সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন না বরং তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-খুশীর সঙ্গে ও সহাস্য বদনে মিশতেন। তাঁদের বাচ্চাদের কোলে বসাতেন। স্বাধীন হোক কিংবা ক্রীতদাস-দাসী, ফকীর-মিসকীন সকলের দাওয়াতই কবুল করতেন। পীড়িতের সেবা করতেন, শুশ্রুষা করতেন-তা সে শহরের শেষ প্রান্তেই থাকুক না কেন। মা'যূর-এর ওযর কবুল করতেন (আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত, আল-হিল্‌য়া)। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মজলিসে তাঁকে কখনো পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি যাতে অন্যের কোনরূপ কষ্ট হয়। তাঁর সাহাবায়ে কিরাম একে অন্যের কবিতা শুনতেন ও শোনাতেন এবং জাহিলী যুগের কোনো কোনো কথা ও ঘটনার আলোচনাও করতেন। এ সময় তিনি চুপ করে থাকতেন কিংবা মুচকি হাসতেন।

তিনি অত্যন্ত কোমল অন্তকরণবিশিষ্ট, স্নেহ-ভালবাসা ও দয়ামায়ার সাক্ষাৎ

প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি তদীয় কন্যা ফাতিমা (রা)কে বলতেনঃ আমার সন্তানদ্বয় (হাসান ও হুসায়ন রা)কে ডেকে দাও। ডাক দিতেই তাঁরা দৌড়ে আসতেন। তখন তিনি তাঁদের দু'জনকে সোহাগ ভরে চুমু খেতেন ও কোলে তুলে নিতেন, বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতেন (তিরমিযী)। তাঁর এক দৌহিত্রকে মরণোম্মুখ অবস্থায় তাঁর কোলে তুলে দেওয়া হলে দেখা গেল তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এতদ্দৃষ্টে তাঁর চোখ ফেটে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত সা'দ(রা) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! একি (আপনিও কাঁদছেন)? তিনি বললেনঃ এ স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ভেতর যাকে চান দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমদিল বান্দাদের ওপরই দয়া প্রদর্শন করেন (বুখারী)।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) ও ছিলেন (তিনি তখনও মুসলমান হননি)। অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের মত তাঁকেও কষে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ফলে তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন আর তাঁর কাতরানির কারণে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। জনৈক আনসার সাহাবী বিষয়টি বুঝতে পেরে হযরত আব্বাস (রা)-এর বাঁধন একটু ঢিলা করে দেন। আনসার সাহাবীর এই মমতা প্রদর্শন আল্লাহ্র রসূল (সা)-কে উৎসাহিত করতে পারেনি যে, হযরত আব্বাস ও একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হোক। ফলে রসূলুল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে অপরাপর বন্দীদের বাঁধনও অনুরূপ ঢিলা করে দেওয়া হয়। আনসার সাহাবী যখন দেখতে পেলেন যে, হযরত আব্বাস-এর বাঁধন ঢিলা করে দেওয়াতে আল্লাহ্র রসূল খুশী হয়েছেন তখন তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন যে, তাঁর পিতৃব্যকে বিনা মুক্তি পণে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আল্লাহ্র রসূল তার এই পরামর্শ কবুল করেননি।

তিনি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন। লোকের অবস্থার প্রতি তিনি খুবই রেআয়েত করতেন। মানব স্বভাবে বিরক্তি ও ক্লান্তিবোধ করা এবং সাময়িকভাবে তাদের মাঝে ভীরুতা ও একঘেয়েমী সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। এসবের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতেন। এজন্যই তিনি মাঝে মাঝে ওয়াজ-নসীহত বিরতি দিয়ে করতেন, যাতে বিরক্তি কিংবা একঘেয়েমী সৃষ্টি না হয়। যদি কখনো কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন অমনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেনঃ আমি নামাযে দাঁড়াই এবং চাই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তা আদায় করি। তারপর কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। অতঃপর এই ধারণায় আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি যাতে তার মায়ের কোনরূপ উৎকণ্ঠা কিংবা মানসিক পীড়ার কারণ না ঘটে। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আমার সামনে অপর কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ না করে। কেননা আমি চাই, তোমাদের সামনে

এমনভাবে আমি হাজির হই যে, তোমাদের প্রতি আমার দিল সাফ থাকে।

মুসলমানদের অনুকূলে তিনি ছিলেন স্নেহশীল পিতার মতই। তিনি বলতেন: কেউ সম্পত্তি রেখে মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারী তথা ওয়ারিশদের। আর কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। কমা-কমতি ও সীমাতিরিক্ততা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন দু'টো কাজের মধ্যে কোন একটাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন তখন সব সময় সহজতরটিকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তবে তা এই শর্তে যে, এতে গোনাহ্র নাম-গন্ধও যেন না থাকে। যদি এতে গোনাহ্র সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যেত তবে তিনি এর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করতেন। তিনি আরও বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর ওপর তৎপ্রদত্ত নে'মতের বাহ্যিক প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।

ঘরে তিনি সাধারণ মানুষের মতই থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি নিজের কাপড় নিজেই পরিষ্কার করতেন। নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। নিজের কাপড়ে তালি লাগাতেন। জুতা সেলাই করতেন এবং এভাবে আরও কাজ করতেন। হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি ঘরে কিভাবে থাকতেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি ঘরে কাজে-কর্মের ভেতর থাকতেন। অতঃপর নামাযের সময় হলে নামায আদায়ের জন্য বাইরে চলে যেতেন। তিনি আরও বলেনঃ মানুষের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কোমল এবং সকলের চেয়ে বেশি মহানুভব ছিলেন। আর হাসির সময় তিনি মুচকি হাসি হাসতেন। হযরত আনাস বলেনঃ আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক সদয় ও স্নেহশীল। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন ঃ তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র রসূল কখনো কোন খাদ্য বস্তুর ভেতর দোষ খোঁজেন নি। যদি পছন্দ হয়েছে, খেয়েছেন আর পছন্দ না হলে খান নি।

হযরত আনাস (রা) বলেনঃ আমি দশ বছর আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর খেদমত করেছি। তিনি কখনো 'হু' বলেন নি এবং কখনো এও বলেন নি যে, অমুক কাজ তুমি কেন করলে আর অমুক কাজ কেন করলে না? নবী করীম (সা)-এর সাহাবারা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না এই ধারণায় যে, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন যে, তোমরা আমার প্রশংসা এভাবে বাড়িয়ে

করো না যেভাবে খৃস্টানরা ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) সম্পর্কে করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্র একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে। হযরত আনাস (রা) বলেন, "মদীনার দাসী-বাদীরা কেউ এসে তাঁর হাত ধরত এবং যা বলার বলত ও যতদূর পারত হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত।" 'আদী ইবনে হাতেম আত-তাঈ (রা) যখন তাঁর খেদমতে হাজির হলেন তখন তাকে তিনি নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একজন দাসী? 'আদী ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন এবং নিজে মাটির ওপর বসে পড়লেন। 'আদী (রা) বলেন ঃ এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম তিনি কোন বাদশাহ নন।" জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রসূল (সা) কে দেখে তাঁর ভীতিকর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। তিনি বললেন ঃ ভয় পেয়ো না, আমি কোন বাদশাহ নই। আমি এক কুরায়শ মহিলার সন্তান যিনি শুকনো গোশ্ত খেতেন (ইবনে মাজা)। তিনি নিজের ঘর নিজেই ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতেন উট বাঁধতেন, পশুর ঘাস-পাতা দিতেন, ঘরের খেদমতগারদের সঙ্গে একই আসনে বসে খানা খেতেন আটা মারতে তাদের সাহায্য করতেন এবং বাজার থেকে প্রয়োজনীয় বাজার সওদা নিজেই নিয়ে আসতেন (কিতাবুশ শিফা)।*

যদি কোন লোক সম্পর্কে তিনি খারাপ কিছু জানতে পেতেন তবে তিনি তার নাম ধরে একথা বলতেন না যে, সে এ কাজ কেন করল বরং তিনি এভাবে বলতেন ঃ লোকের কি হল যে, তারা এরকম বলে কিংবা এরকম করে? তিনি তার নাম উল্লেখ না করে তার কাজের বিরোধিতা করতেন ও বাধা দিতেন।

তিনি দুর্বল অবলা পশু ও চতুষ্পদ জানোয়ারের প্রতিও কোমল ও সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য হত্যা করতে চাইলেও ভালভাবে কর, যবাহ্ করলেও ভালভাবে কর। তোমাদের কেউ পশু যবাহ করতে চাইলে সে যেন তার ছুরি ভালভাবে শান দিয়ে নেয় এবং যবাহ্র পশুকে আরাম দেয়। তিনি বলেনঃ এসব অবলা পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। এর পিঠে যখন আরোহন করবে তখন ভালভাবে আরোহন করবে। যখন যবাহ্ করত তার গোশ্ত ভক্ষণ করবে তখনও যেন সে ভাল অবস্থায় থাকে।

তিনি খাদেম, চাকর-বাকর, দাস-দাসী ও শ্রমিকদের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খেতে দাও, তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তাই পরিধান করাও আর আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করো না। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদের খাদেম ও তোমাদেরই সাহায্যকারী, মদদগার। যার ভাই তার অধীনে তার উচিত হবে সে যা খাবে

তাকেও তাই খাওয়াবে, যা নিজে পরবে তাকেও তাই পরাবে, পরতে দেবে। তাকে এমন কাজ করতে দেবে না যা তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে। যদি তাকে এমন কাজ করতে দিতেই হয় তবে তুমি তার কাজে সহযোগী হবে, তাকে সাহায্য করবে।

একবার এক বেদুঈন আল্লাহ্‌র রসূলের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল যে, আমি আমার নওকরকে দিনে কতবার ক্ষমা করব? তিনি বললেনঃ সত্তর বার। তিনি আরও বলেছেনঃ শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ('নবীয়ে রহমত' থেকে সংক্ষেপিত, প্রমাণপঞ্জী মূল গ্রন্থে পাওয়া যাবে)।

রসূল (সা)-এর গুণাবলী

সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষের স্বভাব হল এই যে, মানুষ তার প্রিয়তম ব্যক্তির আচার-আচরণ ও অভ্যাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। শরীয়তের বিধান অনুসারে সে এ জন্য বাধ্য নয় কিংবা আইনত সে এর পাবন্দও নয়। প্রেম বা ভালবাসার আইন সবার থেকে ভিন্ন (প্রেম না মানে রীত)। সত্যিকারের প্রেমিক তার প্রিয়তমের আচার-আচরণ ও অভ্যাস, তার পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিস এবং এর বিপরীতে সে কি অপছন্দ করে, তার চালচলন, আচার-আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হয় এবং তার উঠা-বসা, চলাফেরা, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ– এমন কি সে সব সম্পর্কেও সে অবহিত হতে চায়, যা কোন আইন কিংবা সংবিধানের আওতায় পড়ে না।

এটাই কারণ যেজন্য উলামায়ে কিরাম সেই প্রাচীনকালেও নবী করীম (সা)-এর গুণাবলীর ওপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ ধারা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে ইমাম তিরমিযীর 'শামায়েল' নামক গ্রন্থটি (অবশ্য সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সীরাতকার ও মুফাসসির হাফেজ ইবনে কাছীর এ বিষয়েও 'শামায়েলু'র-রাসূল' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন)। এখানে আমরা উক্ত গ্রন্থের 'শামায়েল নববী' থেকে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু অংশ পেশ করছি।

'আল্লাহ্‌র রসূল যখন পথ চলতেন তখন মনে হত, তিনি চড়াই থেকে (ঢাল) উৎরাইয়ের দিকে নামছেন। যখন তিনি কারুর দিকে তাকাতেন তখন তাঁর গোটা শরীরই সেদিকে ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর চোখ সর্বদাই অবনত থাকত। আসমানের মুকাবিলায় যমীনের দিকেই তাঁর চোখ থাকত বেশী।

তিনি সাধারণত চোখের প্রান্তদেশ দিয়ে দেখতেন। পথ চলার সময় তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সামনে অগ্রসর করিয়ে দিতেন এবং নিজে পেছনে থাকতেন। কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই তিনি সালাম দিতেন।

নবী করীম (সা)-এর মাথার চুল কানের লতি ও ঘাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত লম্বা ছিল অর্থাৎ খুব বেশি লম্বাও নয়– আবার খুব একটা খাটোও নয়। মাথার মাঝ দিয়ে সিঁথি কাটতেন। মাথায় অধিক পরিমাণে তেল ব্যবহার করতেন। দাঁড়ি খুব বেশি আচঁড়াতেন। যখন ওযু করতেন কিংবা চিরুনী ব্যবহার করতেন অথবা পাপোশ ব্যবহার করতেন তখন ডান দিক দিয়ে শুরু করতে পছন্দ করতেন। তাঁর কাছে একটি সুরমাদানী ছিল। প্রতি রাতে প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। পোশাকের মধ্যে কোর্তা ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয়। নতুন কাপড় পরিধান করলে খুশী হতেন ও বলতেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই কোর্তাটি মেহেরবানী করে আমাকে দান করেছেন। ঠিক তেমনি পাগড়ী, চাদর প্রভৃতি পরিধান কালেও একথা বলতেন। এরপর নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন ঃ

اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسئلك خيره و خيرما صنع له و

اعوذبك من شره و شر ما صنع له

" হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার নিমিত্ত এবং এটা পরিধান করবার জন্য তোমার শুকরিয়া আদায় করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই কাপড়ের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এই কাপড় যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তারও কল্যাণ কামনা করছি। আর এই কাপড়ের অশুভ ও অমঙ্গল থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা করছি এবং যে জন্য ও যেই উদ্দেশ্যে এই কাপড় তৈরি করা হয়েছে তার অমঙ্গল থেকেও তোমার আশ্রয় কামনা করছি।"

তিনি বলতেন, সাদা কাপড় পরিধান কর। সাদা কাপড়ই পরিধান করা উচিত এবং মৃতের দাফন-কাফনও সর্বদা সাদা কাপড়েই করা সমীচীন। এটা সর্বোত্তম পোশাকের মধ্যে গণ্য। আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশী রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে দু'টো সাদা কালো মোজা পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পরিধান করেন ওযূ সমাপনের পর তার ওপর মাসহও করেন এবং তালিযুক্ত জুতা পায়ে তিনি নামায পড়েন। তিনি এও বলতেন যে, তোমরা এক পায়ে জুতা পরে হাটবে না বরং দুই পায়ে জুতা পরে চলবে অথবা দু'টোই খুলে হাটবে। তিনি বাম হাতে খানা খাওয়া এবং কেবল একপায়ে জুতা পরে চলা থেকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন যে, জুতা পরবার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরবে আর খুলবার সময় বাম পায়ের জুতা প্রথমে খুলবে। তিনি ডান হাতে আংটি ব্যবহার করেছেন। তিনি একটি আংটি বানিয়ে ছিলেন যার এক লাইনে 'মুহাম্মদ,' দ্বিতীয় লাইনে 'রসূল'

محمد
رسول
الله

এবং তৃতীয় লাইনে 'আল্লাহ' লিখিত ছিল অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল)। পায়খানায় যাবার সময় আংটিটি খুলে রেখে যেতেন।

মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন মক্কা মুকার্রামায় প্রবেশ করেন তখন মাথায় কালো রঙের পাগড়ী ছিল। পাগড়ী পরবার সময় এর শামলা দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ফেলে দিতেন। হযরত উবায়দ ইবনে খালিদ আল-মুহারিবী (র) বলেন যে, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় একবার যাচ্ছিলাম। এমন সময় পেছন দিকে কাউকে বলতে শুনলাম, লুঙ্গি ওপরে তোল। একথা কে বলল-তা দেখার জন্য পেছনে ফিরে তাকাতেই হুযূর আকরাম (সা)-কে দেখতে পেলাম। আমি বললাম যে, হুযূর! এটা তো একটা মামুলী চাদরিয়া মাত্র (এর মধ্যে অহংকারের কি আছে?)। তিনি বললেন: তোমার জন্য আমার আদর্শ নেই কী? (এ কথা বলার পর) তাঁর লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, তা হাটু ও পায়ের টাখনূর মাঝামাঝি ঝুলছে।

তিনি হেলান দিয়ে কিংবা কোন কিছুতে ঠেস দিয়ে খেতেন না এবং বলতেন যে, আমি হেলান দিয়ে কিংবা ঠেস দিয়ে খাই না। খাওয়ার পর তিনবার আঙুল চেটে খেতেন। তিনি নিচে বসে এবং থালা ওপরে রেখে কখনো খেতেন না কিংবা ছোট্ট তশতরীতেও খানা খেতেন না। তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটি (চাপাতির ন্যায়) পাকানো হয়নি। হযরত কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তাহলে তিনি কিসের ওপর রেখে খানা খেতেন? জওয়াবে তিনি বললেন যে, এই চামড়ার দস্তরখানের ওপর। তিনি লাউয়ের তরকারী খুব পছন্দ করতেন, হালুয়া ও মধু খুব পছন্দ করতেন। গোশতের মধ্যে সামনের দু'পায়ের (রানের) গোশ্ত পছন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, এমন নয় যে, সামনের রানের গোশ্তই তিনি বেশি পছন্দ করতেন বরং কখনো গোশ্ত খাবার সুযোগ হলে যেহেতু সামনের রানের গোশ্ত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হত তাই তিনি এটা বেশি পছন্দ করতেন যাতে করে যথা সত্বর খাওয়ার পালা শেষ করে তিনি তাঁর মূল কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। ঠিক তেমনি হাড়ি ও পাতিলের অবশিষ্ট খানা খুব পছন্দ করতেন।

তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাম না নিয়ে খায় তার সঙ্গে শয়তান শরীক হয়। তিনি বলেছেন ঃ কেউ খাবার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলতে যদি ভুলে যায় তাহলে সে যেন এই কথা বলে ঃ بسم الله اوله اخره

"আল্লাহ্র নামে, এর শুরুতেও এবং শেষেও।"

খানা শেষে বলতেন ঃ

الحمد لله الذى اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمين

"সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।"

সামনে থেকে যখন দস্তরখান তুলে ফেলা হত তখন তিনি বলতেন ঃ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع و لا مستغنى عنه ربنا

"আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় উত্তম, বরকতময় অনেক প্রশংসা, সেই আল্লাহ যাঁর থেকে কেউ বেনিয়ায (অমুখাপেক্ষী) হতে পারে না আর না পারে কেউ বিদায় আরয জানাতে। তিনি আমাদের প্রতিপালক প্রভু!"

তিনি আরও বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা খুব খুশী হন যখন বান্দা কিছু খায় ও কিছু পান করে, এরপর এর ওপর প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তন করে।

ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয় পানীয়। তিনি বলতেন যে, খাদ্য ও পানীয়ের বিকল্প হিসেবে দুধের মত আর কোন জিনিস নেই। তিনি যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন এবং পানি তিন শ্বাসে পান করতেন।

তাঁর কাছে একটি আতরদান ছিল যা থেকে তিনি আতর লাগাতেন। আর কেউ যদি হাদিয়া হিসেবে আতর পেশ করত তাহলে তা ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি বলতেন যে, তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়: বালিশ, সুগন্ধি তৈল ও দুধ। তিনি বলেছেন যে, পুরুষালী সুগন্ধি তাই যার খোশবূ ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তার রঙ বোঝা যায় না। আর মেয়েলী খোশবূ তাই যা চটকদার বটে, কিন্তু সুগন্ধ নেই।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) তোমাদের মত তাড়াহুড়ো করে কথা বলতেন না, বরং তিনি পরিষ্কার ও সাফ সাফ কথা বলতেন। প্রতিটি বিষয়বস্তু অপরটি থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হত। ফলে পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকটি তাঁর কথা মনে গেঁথে নিতে পারত। কোন কোন সময় একটি কথা তিনবার করে বলতেন যাতে শ্রোতা কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারে। তিনি সাধারণত মুচকি হাসতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা) বলেন যে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মত বেশি মুচকি হাসি হাসতে আর কাউকে দেখি নাই এবং কোন কোন সময় এভাবেও হেসেছেন যদ্দারা তাঁর মুবারক দাঁত দেখা গেছে। জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার মুসলমান হবার পর কোন সময় আমাকে তাঁর খেদমতে আসতে বাঁধা দেননি আর যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) আমাদের সঙ্গে মিশতেন এবং হাস্য-রসিকতাও করতেন। একবার আমার ছোট ভাইটিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ ওহে আবূ উমায়ের! কি হল তোমার নুগায়র-এর (নুগায়ের ছিল

একটি পক্ষী শাবক, পাখীটি খাঁচায় থাকত আর উমায়ের এটাকে নিয়ে খেলত। শাবকটি মারা গেলে তিনি একথা বলেছিলেন)? সাহাবায়ে কিরাম একবার আরজ করেন যে, হুযূর (সা) আমাদের সঙ্গে রসিকতাও করেন। তখন তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, আমি তা করি বটে, কিন্তু কখনো ভুল কথা বলিনা। উদাহরণ হিসেবে তিনি কখনো কখনো আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা (রা)-র কবিতা আবৃত্তি করতেন, কখনো বা অন্য কোন কবির কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবার কখনো বা তিনি কবি তুরফার এই কবিতাংশটিও আবৃত্তি করতেন ঃ

و ياتيك بالاخبار من لم تزود

" তোমাদের কাছে তিনি কখনো এমন খবরও বয়ে নিয়ে আসেন যার কোন প্রকার বিনিময় তোমরা দাও নাই।"

আবার কখনো তিনি বলতেন যে, সবচেয়ে বেশি সত্যি কথা যা কোন কবির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে তা হল লবীদ ইবনে রবী'আর নিম্নোক্ত কথাটি: الا كل شيء ما خلا الله باطل

" জেনে রেখো, আল্লাহ ভিন্ন পার্থিব জগতের আর সব কিছুই নশ্বর, ধ্বংসশীল।" একবার পাথরের আঘাতে তাঁর হাতের আঙুল রক্তাক্ত হয়ে যায়। এ সময় তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

هل انت الا اسبع دميت * و فى سبيل الله لقيت

"তুমি তো আঙুল ভিন্ন আর কিছু নও, কেবল রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া তোমার আর কিছু হয়নি। আর এটাও নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়নি। কেননা তুমি আল্লাহ্র পথেই রক্তাক্ত হয়েছ।"

হুনায়ন যুদ্ধের সময় তিনি নিম্নোক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেনঃ انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, তা মিথ্যা নয়; আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর (মিথ্যা নয় তাও)।"

তিনি কবিতা পাঠের অনুমতিও দিয়েছিলেন এবং এজন্য কবিকে পুরস্কৃতও করেছিলেন [যেমন কবি কা'ব) কে তাঁর কাব্যের জন্য নিজের চাদর প্রদান করেছিলেন] ও তাঁর কবিতা পছন্দ করেছিলেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে শতাধিক মজলিসে উপবেশন করেছি যেসব মজলিসে সাহাবায়ে কিরাম কবিতা পাঠ করেছেন, জাহিলী যুগের কিসসা-কাহিনী উদ্ধৃত করতেন, অথচ তিনি বাধা দেননি, নিরবে শুনতেন, কখনো তাদের সঙ্গে মুচকি হাসতেনও। হযরত হাসসান

ইবনে ছাবিত (রা)-এর জন্য মসজিদে (নববীতে) মিম্বর রাখতেন যাতে তিনি এর ওপর দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র শানে প্রশংসাগীতি গাইতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি এও বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা শানুহু রুহুল কুদুস (ফেরেশতা জিবরীল)-এর মাধ্যমে হাসসানকে সাহায্য করেন যতক্ষণ সে দীনের পক্ষে প্রতিরোধ চালিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ্র রসূলের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর দিতে থাকে।

তিনি যখন শোবার ইচ্ছা করতেন তো ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে শুয়ে পড়তেন এবং বলতেন ঃ رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك

"হে আমার প্রভু- প্রতিপালক! আমাকে তোমার শাস্তি থেকে বাঁচাও সেদিনের শাস্তি থেকে যেদিন উঠাবে তোমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে)।"

বিছানায় যাবার পর এই দো'আ পাঠ করতেনঃ

اللهم باسمك اموت و احيى

"হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মারা যাই ও জীবিত হই।"

ঘুম থেকে জেগে উঠে এই দো'আ পাঠ করতেন ঃ

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور

" সেই আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা যিনি মৃত্যুর পর আমাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।"

যে বিছানায় তিনি শুতেন তা ছিল চামড়ার আর ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল ভর্তি। তিনি রোগীর সেবা করতেন, শুশ্রূষা করতেন। কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হতেন। ক্রীতদাসদের দাওয়াতও কবুল করতেন। তিনি একটি পুরনো পালানের ওপর সওয়ার হয়ে হজ্জ করেন যার ওপর একটি কাপড় ছিল মূল্য হিসেবে যা চার দিরহামের বেশি নয়। তিনি বলতেন যে, কেউ আমাকে বকরীর একটি পায়াও হাদিয়া হিসেবে দিলে আমি তা কবুল করব এবং আমাকে এর দাওয়াত দেওয়া হলে আমি তা কবুল করব। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি অপছন্দনীয় জিনিস বা কথা তাৎক্ষণিকভাবে মুখের ওপর নিষেধ করতেন না। তিনি হাদিয়া কবুল করতেন এবং এর বিনিময় প্রদান করতেন। তিনি কুমারী রমণীর চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন। কোন জিনিস অপছন্দ হলে তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে মানবতার স্থান ও মর্যাদা

মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা ও প্রতিনিধি

ইসলাম আমাদের বলেছে যে, দুনিয়ার বুকে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা ও প্রতিনিধি (খলীফাতুল্লাহ ফি'ল-আরদ) এবং দুনিয়ার ট্রাস্টি। পৃথিবীটা হল একটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আর মানব জাতি হল এর মুতাওয়াল্লী। এখানকার ব্যবস্থাপনা ও দিক-নির্দেশনা তার দায়িত্ব। দুনিয়াতে ছোট-বড় অনেক রকম ওয়াক্‌ফ হয়। এই গোটা বিশ্ব, এই সমগ্র সৃষ্টিজগত এক বিশাল আজীমুশ-শান ওয়াক্‌ফ (ট্রাস্ট)। এটা কারুর একক কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয় অথবা এটা কারুর বাপ-দাদার সম্পত্তিও নয় যে, যেভাবে খুশি খাবে-দাবে, উড়াবে, নষ্ট করবে। এই ওয়াক্‌ফের মধ্যে জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি , গাছ-পালা, নদী-নালা- সাগর , পাহাড়-পর্বত, স্বর্ণ-রৌপ্য, খাদ্যদ্রব্যসহ দুনিয়ার হাজারো সামগ্রী রয়েছে– এসবই মানুষের হাতে, মানুষের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা সে এসবের মেযাজ সম্পর্কে জানে এবং সে এসবের প্রতি সহানুভূতিশীলও বটে। মানুষ স্বয়ং এই ওয়াক্‌ফ (ট্রাস্ট) -এর মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছে আর সে এই মাটির সন্তান। আর ব্যবস্থাপকের জন্য তার ব্যবস্থাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, সেসবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সম্পর্কিত হওয়া শর্ত। মানুষ দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত। এর ভেতর তার জীবন–জীবিকার জন্য অপরিহার্য সকল সামগ্রী রেখে দেওয়া হয়েছে। এজন্য মানুষই কেবল এর ভাল ট্রাস্টি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে লাইব্রেরীর কথাই ধরুন। লাইব্রেরী দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনা তিনিই ভাল করতে পারেন যার জানার প্রতি আগ্রহ আছে, বইয়ের প্রতি যিনি আর্কষণ বোধ করেন। কোন লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনা যদি কোন মূর্খের হাতে ন্যস্ত করা হয়-তা সে যতই ভদ্র ও শিষ্ট হোকনা কেন, সে কখনোই ভাল লাইব্রেরিয়ান হতে পারবে না। পক্ষান্তরে যিনি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী, বইয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে, তিনি এর (লাইব্রেরীর) পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবেন, লাইব্রেরীর সংগ্রহ বাড়াবেন এবং এর উন্নতি সাধনে তৎপর হবেন।

মানুষ যেহেতু এই মাটির পৃথিবীর বিধায় এর প্রতি তার আকর্ষণ রয়েছে,সে এর মুখাপেক্ষীও বটে, এর সম্পর্কে সে ওয়াকিফহালও, এর প্রতি সহানুভূতিশীল, তদুপরি তাকে এখানেই থাকতে হবে, মরতেও হবে এখানেই বিধায় সঙ্গত ভাবেই আশা করা চলে যে, সে এর পুরোপুরি দেখাশোনা করবে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহরাশি ও সম্পদরাজির অনুসন্ধান চালাবে। এ কাজ সে ছাড়া আর কেউ এত ভালভাবে সম্পাদন করতে পাররে না, পাবে না।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষই উপযুক্ত

হযরত আদম (আ)-কে যখন আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করলেন এবং যমীনের বুকে তাকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন তখন ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ্র পাক—পবিত্র ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টি, যাঁরা না পাপ করে আর না পাপের ইচ্ছাই পোষণ করে, বললঃ হে মালিক! আপনি এমন একজনকে আপনার প্রতিনিধি বানাচ্ছেন যারা দুনিয়ার বুকে গিয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে, খুন-খারাবি করবে। আমরাই তো আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আমরাই আপনার ইবাদত- বন্দেগীতে রত আছি। অতএব এ মর্যাদা আমাদেরকেই দিন। আল্লাহ্ উত্তর দিলেনঃ তোমরা তা জানো না যা আমি জানি। এরপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) ও ফেরেশতাদের পরীক্ষা নিলেন। যেহেতু আদম এই মাটি থেকেই সৃষ্ট এবং এই দুনিয়ার ব্যবহার তাঁকেই করতে হবে, তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে যেহেতু দুনিয়ার সম্বন্ধ রয়েছে , কেননা তিনি (আদম)-এর প্রতিটি জিনিষ সম্পর্কে অবহিত, ফলে তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। ফেরেশতাদের সঙ্গে মাটির পৃথিবীর কোন সম্পর্ক ছিল না, সেজন্য তারা উত্তর দানে ব্যর্থ হল। আর এভাবেই আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা এবং এই ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য শত দুর্বলতা সত্ত্বেও মানুষই উপযুক্ত বরং এসব দুর্বলতা ও প্রয়োজনই তাকে এই পদের উপযুক্ততা প্রমাণ করে। দুনিয়ায় যদি ফেরেশতা থাকত তাহলে দুনিয়ার অধিকাংশ নে'মত বেকার ও নিরর্থক প্রমাণিত হত এবং এর সেই উন্নতি ও অগ্রগতি কখনোই হত না যা মানুষ তার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার দরুন সাধন করেছে।

সফল ও সার্থক স্থলাভিষিক্ত

কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্তের এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য যিনি তাকে প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। সে তাঁর আখলাক ও গুণাবলীর নমুনা হবে, হবে প্রতিবিম্ব। যদি আমি এখানে কারুর স্থলাভিষিক্ত হই তবে সফল, সার্থক ও বিশ্বস্ত স্থলাভিষিক্ত তথা প্রতিনিধি হিসাবে কেবল তখনই কথিত হব যখন আমি আমার সাধ্য মতো তাঁকে অনুকরণ এবং নিজের ভেতর তাঁর (স্বীয় মালিকের) গুণাবলী সৃষ্টি করব। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, নিজেদের ভেতর তাঁর আখলাক সৃষ্টি করব ও তাঁর গুণে গুণান্বিত হব। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁর আখলাক ও গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, করুণা, কৃতজ্ঞতা, উপকার, ব্যবস্থাপনা, পবিত্রতা, ক্ষমা ও ঔদার্য, বদান্যতা, উপহার-উপঢৌকন,

ন্যায় ও সুবিচার, হেফাজত ও তত্ত্বাবধান, প্রেম ও ভালবাসা, জালাল ও জামাল (তেজ ও সৌন্দর্য), অপরাধীকে পাকড়াও ও প্রতিশোধ গ্রহণ, প্রশস্ততা, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশ

আল্লাহ্‌র পয়গম্বর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও(তাখাল্লাকূ বিআখলাকি'ল্লাহ)। মানুষ তার সীমিত মানবীয় বৃত্তের মধ্যে এবং তার সর্বপ্রকার মানবীয় দুর্বলতাসহ আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত আখলাক ও গুণের প্রতিফলন নিজের মধ্যে ঘটাতে পারে। সে কখনো খোদা হতে পারে না, কিন্তু দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র আখলাক ও খোদায়ী গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারে আর এটাই একজন সত্যিকারের প্রতিনিধির কাজ। আপনি পরিমাপ করতে পারেন যে, যদি মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মনে করতে শুরু করে এবং তাঁর আখলাক ও গুণাবলীকে নিজেদের জীবনের মানদণ্ড স্থির করে নেয় তাহলে স্বয়ং তাঁর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং তাঁর খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের অধীনে দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের অবস্থা কি হতে পারে? ইসলাম মানুষের সর্বোচ্চ ও ভারসাম্যময় ধারণা প্রদান করে এবং সে মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ও মাটির পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর স্থলবর্তী এবং এই আজীমুশ-শান ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক, ট্রাস্টি) হিসাবে অভিহিত করে। এরচেয়ে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর কিছু হতে পারে না এবং মানবতার এর চেয়ে বড় মে'রাজও আর নেই।

বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী দুই ধারণা

কিন্তু মানুষ স্বয়ং দুই বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী ধারণা কায়েম করেছে। কোথাও মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং তার পূজা-অর্চনা শুরু হয়েছে। কোথাও তাকে পশুর অধম ভাবা হয়েছে এবং তাকে ছাগল-ভেড়ার মতো হাঁকানো হয়েছে। কতক মানুষ নিজেই খোদা হয়ে বসেছে এবং কেউ কেউ নিজেদেরকে পশুর অধম ভেবেছে। তারা মনে করে যে, পেট ভর্তি তথা ক্ষুধা নিবৃত্তি আমাদের একমাত্র কাজ আর আমাদেরকে কেবল প্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এ দু'টো ধারণাই ভুল। কেবল ভুলই নয়—প্রকাশ্য ও স্পষ্ট জুলুমও বটে। মানুষ যেমন খোদা নয়, তেমনি সে পশুও নয়। মানুষ মানুষই, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সমগ্র দুনিয়া তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর সে আল্লাহ্‌র জন্য।

গোটা দুনিয়া তার সামনে জওয়াবদিহি করবে আর সে আল্লাহ্র সামনে জওয়াবদিহি করবে। এই পৃথিবী, এই দুনিয়া কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি একটি ওয়াক্ফ আর মানুষ এর মুতাওয়াল্লী। এমত ধারণা ও এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে দুনিয়াকে তার যথাযথ ভূমিকায় স্থাপন করা যাবে না। ইতিহাস সাক্ষী যে, মানুষ যখন সঠিক রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছে, নিজ সীমা অতিক্রম করেছে এবং মানুষের খোদা হয়ে বসার চেষ্টা চালিয়েছে এবং নিজেকে দুনিয়ার প্রকৃত মালিক-মোখতার ভেবেছে কিংবা (এর বিপরীতে) নিজের সম্মান ও মর্যাদা থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং নিজেকে পশু ভেবেছে অথবা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে এবং জীবনের দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্তব্য পালনে সে অনীহা প্রকাশ করেছে, ফলে সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে এবং এই দুনিয়াও বরবাদ হয়েছে।

ঐক্য ও ভালবাসার পয়গাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, একে অপরের রক্ত পিয়াসী, একে অন্যের মুখ দেখতেও ছিলে অনীহ। এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।" আয়াতে কারীমা একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মক্কায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সেখানকার লোকেরানিজেদের নির্বুদ্ধিতার দরুন একথা বুঝলনা যে, ইনি (মুহাম্মদ) আমাদের ভাল আমাদের চান, কল্যাণ চান, মঙ্গল চান। ইনি আমাদেরকে মাটির আসন থেকে ওপরে উঠাতে চান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবমাননাকর জীবনের হাত থেকে টেনে বের করে এমন এক কওম ও জাতি বানাতে চান যাদের দ্বারা গোটা বিশ্বে আলোর বিস্তার ঘটবে, সারা দুনিয়ায় প্রেম ও ভালবাসার রাজত্ব কায়েম হবে, সমগ্র পৃথিবী থেকে লড়াই-ঝগড়া খতম হবে, বিভেদ ও অনৈক্য দূর হবে, সারা দুনিয়ার মানুষ নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে পারবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যেই যোগ্যতা দান করেছেন, শৌর্য-বীর্য, দানশীলতা, ভালবাসা ও সম্পদের অজস্র নে'মত দান করেছেন সে সবের সঠিক ব্যবহার হবে৷ যেই যোগ্যতা ছোট ছোট ও মামুলী কাজে ব্যয় হচ্ছে। এক কওম অপর কওমের সঙ্গে লড়ছে। এক দেশ অন্য দেশের শত্রু। আত্মীয়-পরিজনের মধ্যেই হাজারো রকমের ঝগড়া-বিবাদ। আল্লাহর নাফরমানী ব্যাপক। এমন সব কথা ও কাজ হচ্ছে

যদ্দ্বারা আল্লাহ নারায হন, অসন্তুষ্ট হন, তাঁর ক্রোধের সঞ্চার হয়। জঙ্গলে যেভাবে এক প্রাণী আরেক প্রাণী শিকার করে তেমনি মানুষ মানুষকে শিকার করছে।

ইসলাম চাচ্ছিল তাদেরকে এই ধ্বংস ও অধঃপতনের হাত থেকে বের করে সৌভাগ্যের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তা বোঝেনি। তাদের ভেতর এই মানসিকতা কাজ করছিল যে, অমুক খান্দান, অমুক পরিবারের কোন লোক কেন এত ওপরে উঠবে। না, তা হতে দেওয়া যাবে না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তদীয় সাহাবায়ে কিরামের জীবন যখন মক্কায় দুর্বিষহ হয়ে উঠল তখন তাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

প্রতিটি লোকের কাছেই তার স্বদেশ বড় প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় এর চেয়েও মহত্তর।

আওস ও খাযরাজের যুদ্ধ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারী সঙ্গী-সাথীবৃন্দ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন সেখানে আরেক মুসীবত ছিল। মদীনায় ছিল দু'টি গোত্র। এরা উভয়েই ছিল আরব। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত এদের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল। এক গোত্র আরেক গোত্রের কুৎসা গাইত আর নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করত। সামনে যখন মহত্তর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে না তখন ছেঁদো কথা নিয়ে কিংবা খুঁটিনাটি ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে লড়াই-ঝগড়া বেঁধে যায়। আমি একজন জমিদার খান্দানের লোক। আমার নানাকে একজন বড় জমিদার হিসেবে গণ্য করা হত। আমাদের এলাকায় দেখেছি, জমিদারি যুগে ছোটখাটো বিষয় ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা নিয়ে লড়াই ঝগড়া হত এবং তা অনেক সময় মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গিয়ে গড়াত। কোন সময় বাবলা গাছ নিয়ে, কখনো জমির আইল বা সীমা নিয়ে অনৈক্য ও বিভেদ দেখা দিত। আবার অনেক সময় এনিয়েও ঝগড়া বেঁধে যেত যে, আমি যাচ্ছিলাম কোথাও কিম্বা কোথাও থেকে আসছিলাম। অমুকের সাথে দেখা হল, কিন্তু সে আমাকে সালাম করেনি। এসব নিয়ে কেবল ঝগড়াই হ'ত না, পরিণতি সামাজিক বয়কট ও একঘরে করা পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছুত। বাচ্চাদেরকে শাসানো হত, বলে দেওয়া হত যে, তারা যেন অমুকের বাড়িতে না যায়।

বাচ্চারা এসবের কি বোঝে? তারা খেলার সময় সব ভুলে যেত এবং পরস্পরে মিলে মিশে খেলা করত। দরকার তো ছিল এই যে, জ্ঞান সবাইকে মেলাবে, কিন্তু আজকের দুনিয়ায় খেলাধূলা সবাইকে মিলিত করে। এক দেশের টিম আরেক দেশে যায়। অতঃপর সবাই মিলে মিশে খেলা করে। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, জ্ঞান মেলায় না, মেলায় খেলাধুলা। গভীর চেতনা ও উপলব্ধি মেলায় না, মেলায় ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা।

যখন বিরাট ও মহত্তর কোন লক্ষ্য সামনে থাকে না, মানুষের দুনিয়াতে যে আগুন লেগেছে, যেই অন্যায় ও মন্দ রয়েছে, আল্লাহ্‌র গজবের উস্কানি দানকারী মানবতার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ধ্বংসের যে ঘটনা ঘটছে এসবের জন্য ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতি যখন থাকে না তখন শিশুদের মতো খেল-তামাশাই ভাল লাগে কিংবা এ ধরনের মামুলী মামুলী মতানৈক্যকেই মানুষ গুরুত্ব দিতে থাকে- যার জন্য দুঃখও হয়, আবার হাসিও পায়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীদেরও এই অবস্থাই ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা পরস্পরে এভাবেই লড়াই-ঝগড়া করত। তারা একে অন্যের রক্তে নিজেদের পিপাসা মেটাত। তাদের এথেকে বড় ও মহত্তর আর কোন লক্ষ্য ছিল না। এই আবেগ তাদের ভেতর বছরের পর বছর ধরে চলে আসছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন মদীনায় গিয়ে পৌছুলেন তখন তাদের সামনে মহত্তর লক্ষ্য এসে হাজির হল, সত্য তাদের হাতে ধরা দিল। ফলে তাদের চেহারাটাই গেল পাল্টে। তারা একদেহ এক প্রাণে পরিণত হল। তারা নিজেদের অতীতের তিক্ত স্মৃতি ভুলে গেল।

মদীনার ইয়াহূদীদের নিকট সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির এই দৃশ্য কাংক্ষিত ছিল না, পছন্দনীয় ছিল না। তারা উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার খুবই চেস্টা করল। কোন কোন সময় জাহিলী যুগের সে সব কবিতা পাঠ করে শোনাল যে সব কবিতার মধ্যে গোত্রপ্রীতি ও জাহিলী যুগের জাত্যাভিমানের উল্লেখ ছিল। আওস ও খাযরাজ এর প্রভাব কবুল করে নি। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ভালবাসা তাদের পূর্ব শক্রতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিল। তাদের কাছে তাদের পুরনো অতীত এত ঘৃণ্য ও কুৎসিত মনে হত যে, এ সম্পর্কে কখনো চিন্তা করলে তাদের শরীরে কাঁপুনি দেখা দিত, পশম খাড়া হয়ে উঠত। যখন কোন কমন তথা সাধারণ বিপদ এসে দেখা দিত কিংবা সাধারণভাবে প্রিয় জিনিস সামনে এসে হাজির হত, যেমন কা'বার চতুষ্পার্শ্বে এসে সবাই জমায়েত হত, একই পোশাকে, একই বেশে, একই কথা উচ্চারণ করতে করতে, অমনি কা'বার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে এসে যেত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মহিমময়

সত্তা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, আল্লাহ্র বান্দাদের খেদমত, তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও ব্যথা-বেদনা দূর করার প্রেরণা ও আবেগ, তখন তাদের কাছে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো এত তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় মনে হত যে, তার কল্পনায়ও তাদের বমি আসত। হুযূর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমনি এক সুযোগে বলেছিলেনঃ গোল্লায় যাক এরকম নাপাক ও তুচ্ছ ব্যাপারগুলো।

ঘটনা ছিল এই যে, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একবার এক কুয়ার ধারে সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়। একজন উত্তেজিত হয়ে সাহায্যের জন্য তার গোত্রের লোকদের ডাক দেয়। অপর লোকটিও উত্তেজিত হয়ে তার গোত্রের লোকদেরকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায়। হুযূর (সা) খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন এবং উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন যে, জাহিলী যুগের এসব আচরণ ছেড়ে দাও। এ খুবই হীন ও নীচ জাতীয় কাজ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের বরকতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এমন বিপ্লব দেখা দেয় যে, যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিক, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, মরণোন্মুখ অবস্থায় পিপাসায় কাতর হয়ে পানি পানি করছে। পানি এলে পাশের থেকে অপর এক আহত সৈনিক পানি বলে চিৎকার করে ওঠে। প্রথম সৈনিক নিজে পানি গ্রহণ না করে দ্বিতীয় সৈনিককে দেবার জন্য ইশারা করে। এই যে নিজের মুকাবিলায় অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান, এই জযবা, এই আবেগ ও প্রেরণা ইসলামের সম্পর্ক, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি প্রেম এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসাই সৃষ্টি করেছিল। এই সম্পর্কের নেশা এমনই তাদেরকে পেয়ে বসেছিল যে, মদীনার আনসাররা মক্কার মুহাজির ভাইদেরকে নিজেদের দোকান-পাট, ক্ষেত্র-খামার ও সহায়-সম্পত্তিতে পর্যন্ত অংশীদার বানিয়েছিল।

শির্ক-এর পর সবচে' অপসন্দনীয় জিনিস পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শির্ক-এর পর সবচে' বেশি যে জিনিসের নিন্দা করেছেন তা হল পারস্পরিক হানাহানি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ। হাদীস পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, শবে বরাতে, যে রাত্রে সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়, আল্লাহ্র করুণা-সিন্ধুতে যখন উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সেই মুহূর্তেও তিন ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় না ঃ (১) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান; (২) মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি; (৩) সেই ব্যক্তি যার মনে অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা কিংবা বিদ্বেষ থাকে। তিনি বিশেষভাবে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। মহানবী (সা) বলেন যে, আমার পরম প্রভু-প্রতিপালক আমাকে যে

নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে এও রয়েছে যে, যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি যেন তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করি। যে আমার ওপর জুলুম করে আমি যেন তাকে মাফ করি এবং যে আমাকে মাহরূম করে, বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।

যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব ও ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করায় কোন কৃতিত্ব কিংবা বুযুর্গী নেই। কৃতিত্ব ও বুযুর্গী তো সেখানে, যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে, আমার ক্ষতির ধান্ধায় ঘোরে, তার সঙ্গে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করায়।

আল্লাহ্ মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে হতাশ নন

মানবগোষ্ঠির সঙ্গে আল্লাহ্র ব্যবহার এবং মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে মানবগোষ্ঠীর ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ মানব জাতির ব্যাপারে হতাশ নন। তাঁর মেহেরবানী ও তাঁর অনুগ্রহরাজি এই বিশ্বজগতের ওপর, এই জগত সংসারের ওপর অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুই মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে পূর্ণ আশাবাদী। কিন্তু আমাদের পারস্পরিক ব্যবহার সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে আশাহত হয়ে পড়েছি।

একজন চিন্তাবিদ বলেন, যে শিশু এই পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করে সে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ মানবজাতি সম্পর্কে হতাশ নন। তিনি হতাশ হলে এই জাতির পরিবৃদ্ধি ঘটাতেন না; তাকে তার ভাগ্য ও যোগ্যতার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য দুনিয়ায় পাঠাতেন না। কিন্তু মানুষ মানুষের গলায় ছুরি চালাচ্ছে, তাকে ঘৃণা করছে। মানুষ মানুষকে শোষণ করছে, তাঁর রক্ত শোষণ করছে, তাকে গ্রাহক ভেবে ফায়দা লুটছে। সে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দ্বারা ঘোষণা করছে যে, মানবতার যোগ্যতা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সে নিরাশ। আল্লাহ্ এবং মানুষের এই প্রদর্শনী অব্যাহতভাবে জারি আছে। বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দু ডেকে বলছে যে, বিশ্বের স্রষ্টা তাঁর পিপাসার্ত মাখলুক সম্পর্কে, তার জালিম সৃষ্টি সম্পর্কে এখনও নিরাশ নন। যমীনের বর্ধন শক্তি এখনো বিদ্যমান। তার উৎপাদন ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মাটির মানুষদের সম্পর্কে হতাশ নন। সূর্য তার অবারিত আলো বিকীরণ করে যাচ্ছে; সেখানে কোন ধর্মঘট নেই। চাঁদ অব্যাহত গতিতে উদিত হচ্ছে এবং তার আলোর বন্যায় পৃথিবীকে প্লাবিত করছে, স্নিগ্ধ আলোয় চক্ষু শীতল করছে, শীতল পরশে ভরিয়ে দিচ্ছে হৃদয় মন। এসবই ডাক দিয়ে বলছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখনও মানব জাতির ব্যাপারে আশাবাদী।

কিন্তু আমার ও আপনার কার্যকলাপ প্রমাণ করছে যে, আমরা মানুষ সম্পর্কে

হতাশ হয়ে পড়েছি। আমরা আমাদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করছি যে, আল্লাহ্র শিল্প-নৈপূণ্যের সর্বোত্তম নমুনা এই মানুষের কোন গুরুত্ব ও মূল্য আমাদের কাছে নেই।

আল্লাহ্র অসীম কুদরত এবং তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি সৌন্দর্যের বিকাশ প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। ফুল, কলি, বারিবিন্দু, দূর্বার পাতা, মাটির কণা, তরুলতা, যার দিকেই তাকাবেন, তার মধ্যে এক বিশাল জগত দেখতে পাবেন। এসবের মধ্যে সবচে' সুন্দর ও আকর্ষণীয় সৃষ্টি হল মানুষ। তামাম বস্তুনিচয় ও সমগ্র বিশ্বজগত তার খেদমতের জন্য সৃষ্ট। এসবই ঘোষণা দিচ্ছে যে, মানুষ তার স্রষ্টা আল্লাহ্র বড়ই প্রিয়, সৃষ্টির সেরা, বিয়ে বাসরের বর। কিন্তু আমার ও আপনার কার্যক্রম প্রমাণ করছে যে, মানুষের মধ্যে ভাল বলতে, সৌন্দর্য বলতে কিছু নেই। আমরা আমাদের কৃতকর্মের দ্বারা আল্লাহ্র আদালতে আমাদের নিজদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করছি যে, আমাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে তুলে নেয়া হোক। আমরা যেন ফেরেশতাদের সেই কথা প্রমাণ করতে চাচ্ছি যার প্রতিবাদ আল্লাহ্ পাক করেছিলেন। মানুষ সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেনঃ আমি যমীনের বুকে একজন খলীফা বানাতে চাই।

তখন ফেরেশতারা আশংকা ব্যক্ত করেছিল ঃ

"আপনি কি এমন একজন সেখানে খলীফা বানাতে চান যে যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে"?

তখন আল্লাহ তা'আলা বস্তুসমূহের নাম সম্পর্কে আদম (আ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সঠিক উত্তর দেন। ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করায় তারা জওয়াব দিতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ই মানুষকে বিজয়ী করেছিলেন আর আমরা সেই মানুষকে হারাচ্ছি।

ভঙ্গুর হলেও সৃষ্টি তার স্রষ্টার নিকট অতি প্রিয়

আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের জানা নেই যে, মানুষ কি কি গুণের অধিকারী। তার থেকে জ্ঞান সমুদ্র কিভাবে উত্থিত হয়। সমুদ্রও তত প্রশস্ত ও গভীর নয়, যত প্রশস্ততা ও গভীরতা রয়েছে মানুষের। তার চোখে ভালবাসার যেই উষ্ণতা আছে, তা পেশ করতে তোমরা অক্ষম। সুকুমার হৃদয়ে আছে প্রেম-ভালবাসা, আছে পেলবতা। এর ওপর সহমর্মিতার আঘাত লাগে যা থেকে তোমরা বঞ্চিত। আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত নির্ভীক কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کروبیاں

"দিলের ব্যথার নিমিত্ত তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; নইলে আনুগত্যের জন্য মুকার্রাব ফেরেশতার নেহাৎ কম ছিল না?"

ফেরেশতাদের কাছে এই সম্পদ নেই। মানুষ আল্লাহ্‌র সমীপে ফেরেশতার তুলনায় আহত দিল্ ও ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় পেশ করতে পারে।

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

"আমীর! খঞ্জর চালানো হয় অন্য কারও ওপর আর আমরা সেই কষ্টে ছটফট করি, কাতরাই। সারা দুনিয়ার ব্যথা আমরা আমাদের দিলে অনুভব করি।"

কারও ওপর ছুরি চলে, কারও পায় কাঁটা ফোটে আর আমাদের দিলে তার ব্যথা অনুভূত হয়। মানুষের কাছে সবচে' বড় পুঁজি হল তার দয়া-মায়ার পুঁজি, প্রেম ও ভালবাসার পুঁজি আর সেই তপ্ত অশ্রু যা মানুষের চোখ থেকে নির্গত হয়, যেই অশ্রু নির্গত হয় বিধবার উলঙ্গ ও বিবস্ত্র মস্তক দেখে, গরীবের চূলায় আগুন জ্বলেনা দেখে, রোগীর আর্ত চিৎকার ও কাতর আর্তনাদ শুনে। এই অশ্রুর একটি কাতরাও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তা তার পানিকে পাক-পবিত্র করে তুলবে, পাপের গহীন জঙ্গলে ফেলা হলে সব পাপরাশিকে জ্বালিয়ে তাকে আলোকময় করে ছাড়বে। ফেরেশতারা অনেক কিছুই পেশ করতে পারে, কিন্তু পারে না এক ফোটা অশ্রু পেশ করতে যার মূল্য সম্ভবত আপনিও অনুধাবন করতে পারেন নি যা এক মানুষ আরেক মানুষের জন্য বইয়ে দেয়।

ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے

"আমরা রাতে উঠে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাই যখন সারা বিশ্ব চরাচর গভীর ঘুমে অচেতন।"

ফেরেশতারা তাদের মালিককে দেখার এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হবার পর আর ঘুমাতে পারে না। কিন্তু সেই মানুষ যে তারই মত মানুষের দুঃখ- ব্যথায় কাতর হয়ে বিনিদ্র রাত কাটায়, তার রাত্রি জাগরণের সাথে ফেরেশতাদের জাগরণের তুলনাই হতে পারে না।

মানুষের কাছে সবচে' দুর্লভ ও মূল্যবান যে বস্তু আছে তা এই যে, অপরের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনায় তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তার ভেতর রয়েছে প্রেম ও ভালবাসার শক্তি। একে নাড়া দেবার মত কোন জিনিস পাওয়া গেলেই তা সচল ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তার কাছে ধর্ম ও গোত্রের ভেদাভেদ থাকে না, থাকে না দেশ-কাল-পাত্রের পার্থক্য। মানুষ দেখে মানুষের হৃদয়। সে হয়

তার ব্যথায় ব্যথাতুর, বেদনায় হয় বেদনাকাতর। চুম্বক যেমন আকর্ষণ করে লোহাকে আর এটাই তার ধর্ম, তদ্রূপ মানুষের হৃদয় নামক চুম্বক আরেক হৃদয়কে আকর্ষণ করে, কাছে টানে।

যা চক্ষু থেকে নির্গত হয়নি তার আবার মূল্য কিসের?

মানুষ যদি এই সম্পদ হারিয়ে ফেলে তাহলে সে দেউলিয়া হয়ে যাবে। যদি কোন দেশ এই সম্পদ থেকে মাহরূম হয়ে যায়, যদি আমেরিকায় সম্পদ, রাশিয়ায় সমাজ ব্যবস্থা এবং আরব জাহানে পেট্রোলের নহর প্রবাহিত হয়, সোনা-রূপার স্রোত বয়ে যায়– কিন্তু সেদেশে প্রেম ও ভালবাসার ঝর্নাগুলো যদি শুকিয়ে যায় তাহলে সেদেশের মত কাঙাল আর কেউ নেই। সেদেশের ওপর আল্লাহ্‌র করুণা ধারা বর্ষিত হবে না।

এখনও মানুষের চোখ অশ্রু বর্ষণে সক্ষম, এখনও মানুষের দিল্ যন্ত্রণায় ছটফট করে, ব্যথা- জর্জরিত হবার ও আঘাত খাবার উপযোগী। যেই দিল এই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তাকে দিল্ না বলে পাথর বলাই শ্রেয়। আল্লাহ্‌র দরবারে এর কানাকড়িও মূল্য নেই, সে মুসলিম, হিন্দু, শিখ কিংবা খ্রিস্টান যাই হোক। দিল্ তো এজন্যই যে, সে তড়পাতে থাকবে, ছটফট করবে, কাঁদবে। তার মধ্যে মাটির চেয়েও উর্বরতা থাকবে, জলপ্রপাতের চেয়েও অধিক তৃষ্ণা নিবারক হবে, সৃষ্টিজগতের চেয়েও প্রশস্ত এবং মেঘের চেয়েও অধিক বর্ষণমুখর হবে।

کوئی جاکر کے کہ دے ابرنیساں سے کہ یوں برسے
کہ جیسے مینہ برستا ہے مارے دیدہ ترسے

সেই চোখ মানুষের চোখ নয় যাতে আর্দ্রতা নেই, তা নার্গিসের চোখ। সেই দিল্ মানুষের নয় যাতে কখনো ব্যথার আঘাত লাগেনি, যা কখনো মানুষের শোকে কাতর হয়নি, তার দুঃখে অশ্রুপাত করেনি, কাঁদেনি, আর্তনাদ করতে শেখেনি। তা নেকড়ে বাঘের হৃদয়। যে কপাল লজ্জায় ও অনুতাপে ঘর্মাক্ত হয়নি তা কপাল নয়, তা তো পাথর। যে হাত মানবতার সেবায় অগ্রসর হয় না সে হাত অবশ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যে হাত মানুষের জীবন সংহারে উদ্যত সেই হাতের চেয়ে বাঘের থাবাও অনেক ভাল। যদি মানুষ খুন করাই মানুষের কাজ হত তাহলে স্রষ্টা তাকে হাতের বদলে তলোয়ারই দিতেন। যদি ধন-সম্পদ জমা করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হত তাহলে তার বুকের ভেতর কম্পমান হৃদয়ের পরিবর্তে লৌহ নির্মিত একটি আলমারীই রেখে দেয়া হত। ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা তৈরি করাই যদি মানুষের কাজ হত তাহলে তাকে মানুষের মস্তিষ্ক না দিয়ে শয়তান কিংবা দৈত্য-দানবের মস্তিষ্কই দেয়া হত।

মানুষকে তার দৈহিক সৃষ্টির দিক দিয়ে স্রষ্টার এক বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি বলা হয়। কিন্তু তার দিলের বিস্ময়কর সৃষ্টি নৈপূণ্যের দিকে লক্ষ্য করলে তার সামনে দৈহিক সৃষ্টিকুশলতাও নিষ্প্রভ মনে হবে। তাকে এমন একটি হৃদয় দেয়া হয়েছে যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে কারো কষ্ট হলে পাশ্চাত্যে বসে সে অস্থির হয়ে পড়ে। হৃদয় জগতের আকুলতা লক্ষ্য করুন! বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের কষে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এদিকে তারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর ওদিকে আল্লাহ্‌র রসূল তাদের কাৎরানির শব্দে ঘুমুতে না পেরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন। এভাবেই কেটে যায় তাঁর সারাটা রাত। দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্নায় মা অস্থির হয়ে পড়বে—এই আশংকায় তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। যে দিল্ কোন মানুষের দিলে আঘাত দেয়, কাউকে কষ্ট দেয় সেই দিল্ কি হিসাবে ধরা চলে?

ভ্রাতৃবৃন্দ! সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সার্বিক আচরণ আমাদের বলে দেয় যে, আল্লাহ মানবজাতি সম্পর্কে নিরাশ নন। আপনার ওয়াটার সাপ্লাই কর্তৃপক্ষ আপনার পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারলে, আপনার বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে আল্লাহ কি তাঁর অনুগ্রহরাজি বন্ধ করে দিতে পারেন না? যেমন এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি ভূপালের অধিবাসীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে নিরাশ নয়, তাদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাও তেমনি এই পৃথিবীতে পানিও দিচ্ছেন, রুটিও দিচ্ছেন। তদুপরি তিনি সকল সৃষ্টিকে মানুষের সেবা করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

গোটা বিশ্ব- কারখানা মানুষের সেবায় নিয়েজিত। আল্লাহ এদের সম্পর্কে নিরাশ হননি। কিন্তু আমরা আমাদের চরিত্র দ্বারা কি প্রমাণ করছি? আমরা কি প্রমাণ করছি যে, আমরা মানুষকে বিরাট কিছু মনে করি, উচ্চতর কিছু ভাবি? আমাদের সমান মনে করি? আমাদের শরীরের অংশ জ্ঞান করি?

আদম-সন্তান পরস্পর এক দেহ। بنی آدم اعضائے یک دیگر اند

এই কর্মধারাই মানব সভ্যতার জন্য সবচে' মারাত্মক বিপদ, বাইরের কোন বিপদ নয়। সেকাল অতীত হয়েছে যখন এক জাতি আরেক জাতির ওপর ঝাপিয়ে পড়ত। আজ বিপদ ভেতরকার। তাহল মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা, মানবতাকে পদদলিত করার বিপদ, মানবতার কল্যাণ কামনা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখার বিপদ। এই বিপদে থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা দরকার, বাঁচানো দরকার।

মানবতার স্থান

আল্লাহ্র বার্তাবাহক নবী-রসূলগণ মানবজাতিকে শিখিয়ে ছিলেন যে, তোমরা যদি নিজেদেরকে দুনিয়ার অনুগত করে নাও এবং আপন প্রবৃত্তিকে নিজেদের ওপর প্রভূত্ব করার সুযোগ দাও, তাহলে এই গোটা জীবনটাই অস্বাভাবিক ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে এবং এমন এক অরাজকতার বিস্তার ঘটবে যে, এই দুনিয়াটা তোমাদের জন্য সাক্ষাৎ জাহান্নামে পরিণত হবে। মানুষ যদি নিজেকেই না চিনতে পারে তাহলে সে তার আসন থেকে ছিটকে পড়বে এবং ধ্বংসের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে। মানবতা ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের দিয়ে তাকে সিজদা করানো হয়েছে। এ থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষের জন্য আপন স্রষ্টা ভিন্ন অপর কারও সামনে তার মস্তক অবনত করা চরম অবমাননাকর। অথচ আল্লাহ্র পর তাঁর ফেরেশতারাই মানুষের সিজদা-পাবার বেশি উপযুক্ত ছিল। কেননা তারা এই জগতের কর্মনিয়ন্তা। তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বৃষ্টি বয়ে নিয়ে আসে, বাতাস প্রবাহিত করে। যেমন একজন শাসক তাঁর প্রতিনিধিকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ফেরেশতাদের মস্তক অবনত করিয়ে একটি পরিচয় পর্ব সম্পন্ন করেছেন যাতে মানব জাতি কেয়ামত অবধি স্মরণ রাখে যে, সে একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কারও সামনে মাথা নত করবে না। কিন্তু মানুষ আপন সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে ভুলে গিয়ে মানবতাকে অপমান করছে, খুন করছে।[১]

---

১. বর্তমানকালে মানবতার যতটা অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং মানবতাকে যেভাবে নিম-মভাবে হত্যা করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করে বর্তমান গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 'পায়ামে ইনসানিয়াত' (মানবতার পয়গাম) নামে আন্দোলনের সূচনা করেন যাতে মানবজাতিকে তার ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় এবং তাদেরকে মানবতার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পুস্তক ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। উপরন্ত মানবতার প্রকৃত দরদী ব্যক্তিদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণকে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে ঃ দফতর হালকায়ে পায়ামে-ইনসানিয়াত
পোঃ বক্স ৯৩, লাখনৌ, ভারত।